দাম : সাত টাকা
স্বস্তিকা
৬৫ বর্ষ, ২ সংখ্যা।। ২০ আগস্ট - ২০১২।। ৩ ভাদ্র - ১৪১৯
১৫ই আগস্ট বিশেষ সংখ্যা
দেশ ভাগ ও 'স্বাধীনতা'...

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

সর্বস্তরেই কোণঠাসা সি পি এম নেতৃত্ব ▯ ৯

খোলা চিঠি : দুধ না খেলে মাওবাদী ছেলে ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১০

স্বাধীনতা সংগ্রামের দুই ধারা ▯ ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১২

দেশভাগ ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ :
ঘটনা ও পটভূমি ▯ বাসুদেব পাল ▯ ১৪

ব্রহ্মাণীমাতার পুজো ও মেলা ▯ নবকুমার ভট্টাচার্য ▯ ২৩

স্বাধীনতা আন্দোলনে কল্পনা দত্ত যোশী ▯ মিতা রায় ▯ ২৬

ভাবনা-চিন্তায় ১৯৪৭ থেকে ২০১২ ▯ শংকর পাল ▯ ২৭

আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে পর্যালোচনা
প্রয়োজন ▯ এস কে চ্যাটার্জী ▯ ২৮

অতিমানস সত্তা ও শ্রীঅরবিন্দ ▯ নীহারেন্দু ভট্টাচার্য ▯ ৩০

দেশভাগ : সাম্প্রতিক সমীক্ষা ▯ নীতিন রায় ▯ ৩৬

অলিম্পিকের দিক্‌চক্রবালে উজ্জ্বল চীন
ও রাশিয়া ▯ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩৯

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

১৫ আগষ্ট বিশেষ সংখ্যা

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ ▯ **ভাবনা-চিন্তা : ২০** ▯ ▯ **বোধন : ২১** ▯ ▯ **ঐতিহাসিক দুর্গ : ২২** ▯
নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩২-৩৩**▯ ▯ ▯ **অন্যরকম : ৩৪** ▯
চিত্রকথা : ৪১

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ২ সংখ্যা, ৩ ভাদ্র, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৪, ২০ আগষ্ট - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা-র বিশেষ বার্ষিক গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান

স্বস্তিকা একটি প্রকৃত জাতীয়তাবাদী নির্ভীক সংবাদ সাপ্তাহিক। আগামী ৯ আগষ্ট, ২০১২, শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে স্বস্তিকা ৬৫ বছরে পদার্পণ করছে। এই উপলক্ষে এবং স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশত জন্মবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি রূপে স্বস্তিকা-র বিশেষ নতুন বার্ষিক গ্রাহক সংগ্রহ অভিযানের এক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। অভিযানের সময়কাল ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১২।

সকল পাঠক-বন্ধুদের প্রতি বিনম্র নিবেদন এই যে, আপনি নিজে এই পত্রিকার গ্রাহক হোন ও অন্যদের গ্রাহক হতে অনুপ্রাণিত করুন। স্বস্তিকা-র বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা মাত্র। অভিযান চলাকালীন এবং সর্বশেষ ৭ই অক্টোবর, ২০১২-র মধ্যে গ্রাহকের সম্পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহকমূল্য স্বস্তিকা দপ্তরে জমা করে রসিদ সংগ্রহ করুন। এর ফলে এবছরের স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা পেতে সুবিধা হবে। চেক বা ড্রাফট্ **Swastika** -এই নামে লিখে স্বস্তিকার ঠিকানায় পাঠাবেন। এছাড়া স্বস্তিকা-র নামে মানিঅর্ডার যোগেও টাকা পাঠাতে পারেন। ঠিকানা— ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৬।

আপনাদের সকলের সহযোগিতার জন্য অত্যন্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই পত্রিকা ৬৫ বছর অতিক্রম করেছে। ভবিষ্যতের জন্যও আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য।

—স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ আসেন, যাঁরা একটা দাগ রেখে যান। এমনই একজন মানুষ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গের প্রথম প্রান্ত সঙ্ঘচালক অধ্যক্ষ কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী। এবছর তাঁর জন্মশতবার্ষিকী। তাঁরই স্মরণে স্বস্তিকা-র শ্রদ্ধাঞ্জলি এই সংখ্যা। লিখেছেন **দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, ডঃ তুষারকান্তি ঘোষ, রোহিনী প্রসাদ প্রামাণিক** প্রমুখ।

।। দাম একই থাকছে — সাত টাকা।।

সম্পাদকীয়

সব মুসলমানের একই সুর

সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য আই পি এস পুলিশ অফিসার নজরুল ইসলাম পুলিশের গাড়ি চড়িয়া আসিয়া মুসলিম ইনস্টিটিউটে পশ্চিমবঙ্গকে মুসলিমস্থান বানাইবার জন্য মুসলিমদের কাছে উমেদারি করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে মুসলমানরা সংখ্যায় কম, এইজন্য রাজ্যে একজন মুসলমান মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়োজন। এই সভায় নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন সিমি এবং আই এস আইয়ের প্রতিনিধি ও সমর্থকেরা হাজির ছিলেন। এটাই স্বাভাবিক ঘটনা। সমগ্র অসম ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ লইয়া মুঘলস্থান বানাইবার যে স্বপ্ন সিমি এবং আই এস আই দেখিতেছে এইটি সেই পরিকল্পনারই অঙ্গ। মুর্শিদাবাদ হিন্দুশূন্য হইয়াছে, মালদা দু-এক বছরের মধ্যেই হিন্দুশূন্য হইবে। নদীয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও উত্তর ২৪ পরগণায় পরিকল্পিতভাবে হিন্দুশূন্য অঞ্চল গড়িবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলি এই কাজে প্রধান সহায়ক। আজ নজরুল ইসলাম যে বক্তব্য রাখিয়াছেন মালদা-মুর্শিদাবাদ-নদীয়ার সীমান্ত অঞ্চলে সিমির সদস্যরা একই বক্তব্য রাখিয়া থাকেন। খাস মহানগরে আই এস আই, সিমির নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে মিটিং করিতে পারিবে না বলিয়া নজরুল ইসলাম তাহাদের হইয়া বক্তব্য রাখিয়াছেন মাত্র। এই রকম এজেন্ট সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ব্লকে ব্লকে রহিয়াছে। রাজনৈতিক দলগুলি দুধকলা দিয়া এইসব কালসর্প বহাল তবিয়তে পুষিতেছে।

আমরা মুসলমানদের যতই প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ দেশপ্রেমিক বলিয়া গলা ফাটাই না কেন 'প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দদুটি ইসলামে নিষিদ্ধ। প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ হইলে সে আর মুসলমান থাকিবে না, ইসলামে কাফের রূপে চিহ্নিত হইবে। তসলিমা নাসরিন, সালাম আজাদ প্রমুখ উদাহরণ রহিয়াছে। আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের একটাই চিন্তা—বিশ্বে তালিবানী শাসন প্রতিষ্ঠা। নজরুল যাহা বলিয়াছেন তাহা এই পরিকল্পনারই অঙ্গ। না হইলে কতজন প্রগতিশীল মুসলমান নজরুলের বক্তব্যের বিরোধিতা করিয়াছেন। তোষণ করিতে করিতে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলি কেবল ভোটের লোভে এই দেশদ্রোহিতাকে সমর্থন করিতেছে। 'প্রয়োজনে মুসলিম অ্যাকটিভিটিজ করিব' এই বাক্য বলিবার পরেও কী রাজ্য কী কেন্দ্রীয় সরকার ভোটের লোভে তাঁহার কেশাগ্রস্পর্শ করিবার সাহস পায় নাই। এদেশে মিরজাফরদের মতো কিছু ব্যক্তি আছে বলিয়াই এইসব দেশদ্রোহী ব্যক্তিদের এত রমরমা। না হইলে আফজল গুরু, কাসভের মতো ভারত-বিরোধী জঙ্গীরা সমর্থন পায় কি করিয়া? যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কেবল মুসলিম ভোটের লালসায় তাঁহার পিতৃপ্রদত্ত পদবী বর্জন করিতে পারেন, সেই রাজ্যে মুসলিমদের এই রকম সাম্প্রদায়িক বক্তব্য চলিতেই থাকিবে। জনসাধারণও বিজেপি ও হিন্দু সংগঠনগুলিকে গাল দিতে যতটা অভ্যস্ত মুসলিমদের দেশদ্রোহী কার্যকলাপের প্রতিবাদ করিতে ততটাই ভীত। এদেশে সংখ্যালঘু তোষণ তালিবান বন্দনা চলিলেও তালিবানদের আপনদেশ পাকিস্তান বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের কি দুর্দশা চলিতেছে তাহা তো আজ প্রকাশ্য। সেইদেশে বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ হিন্দুদের সম্পত্তি লুঠ, ধর্ষণ ইত্যাদি নিত্যকার ঘটনা। এদেশের প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ কতজন মুসলমান তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন?

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

'বেদ' মানে অনাদি সত্যের সমষ্টি; বেদপারগ ঋষিগণ ঐ-সকল সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন; অতীন্দ্রিয়দর্শী ভিন্ন আমাদের মতো সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে সে-সকল প্রত্যক্ষ হয় না; তাই বেদে 'ঋষি' শব্দের অর্থ মন্ত্রার্থ-দ্রষ্টা;—পৈতা গলায় ব্রাহ্মণ নয়। ব্রাহ্মণাদি জাতিবিভাগ পরে হয়েছিল। বেদ শব্দাত্মক অর্থাৎ ভাবাত্মক বা অনন্ত ভাবরাশির সমষ্টি-মাত্র। 'শব্দ' পদের বৈদিক প্রাচীন অর্থ হচ্ছে সূক্ষ্মভাব, যা পরে স্থূলাকার গ্রহণ ক'রে নিজেকে প্রকাশিত করে। সুতরাং যখন প্রলয় হয়, তখন ভাবী সৃষ্টির সূক্ষ্ম বীজসমূহ বেদেই সম্পুটিত থাকে। তাই পুরাণে প্রথমে মীনাবতারে বেদের উদ্ধার দৃষ্ট হয়। প্রথমাবতারেই বেদের উদ্ধার-সাধন হলো। তারপর সেই বেদ থেকে ক্রমে সৃষ্টির বিকাশ হতে লাগল; অর্থাৎ বেদনিহিত শব্দাবলম্বনে বিশ্বের সকল স্থূল পদার্থ একে একে তৈরি হতে লাগল। কারণ, সকল স্থূল পদার্থেরই সূক্ষ্ম রূপ হচ্ছে শব্দ বা ভাব। পূর্ব পূর্ব কল্পেও এরূপে সৃষ্টি হয়েছিল। এ-কথা বৈদিক সন্ধ্যার মন্ত্রেই আছে 'সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ।'

—স্বামী বিবেকানন্দ।

সংবাদ প্রতিবেদন

আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি

অপহৃত বি এস এফ জওয়ান

তরুণ কুমার পণ্ডিত : মালদা ॥ সীমান্তে গুলি চালানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকার জন্য মালদা জেলার কালিয়াচক সীমান্তে আবার এক বি এস এফ জওয়ান চোরাকারবারীদের হাতে আক্রান্ত এবং অপহৃত হলেন। ১৭ ঘণ্টা পর ক্ষত বিক্ষত সেই জওয়ান মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসায় একদিকে জেলা প্রশাসন যেমন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে, অপরদিকে এই ঘটনায় বি এস এফের মধ্যে তীব্র ক্ষোভেরও সৃষ্টি হয়েছে। গত ৩ আগস্ট মালদা জেলার কালিয়াচক থানার চরি-অনন্তপুরের মহব্বতপুর সীমান্তে রাত্রি ১০ টা নাগাদ তিন জন বি এস এফ জওয়ান কিছুটা দূরে ডিউটি করছিলেন। সেই সময় বাংলাদেশী পাচারকারীরা কাঁটাতারের বেড়া কেটে গোরু পাচারের চেষ্টা করলে ১২৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ান বিজয় ভেঙ্কট তাদের বাধা দেন। ২৫-৩০ জনের চোরাকারবারীরা হঠাৎ তাঁকে ঘিরে ধরে রাইফেল কেড়ে নিয়ে অপহরণ করে বাংলাদেশে নিয়ে চলে যায়। বাকি দুজন জওয়ান কিছুক্ষণ পর জানতে পেরে কম্যানড্যান্টকে খবর দেন। রাত থেকেই বিষয়টি নিয়ে বি এস এফের প্রশাসনিক মহলে টনক নড়ে। বি এস এফের পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে অপহরণের ঘটনা জানানো হয়। বি এস এফের অভিযোগ, প্রথম দিকে বি জি বি বা বর্ডার গার্ড অফ বাংলাদেশ জওয়ান অপহরণের ঘটনা স্বীকার করতে চায়নি। বি এস এফের আই জি সুরেন্দ্র কুমার শর্মা বলেন, ফ্লাগ মিটিংয়ের পর বি জি বি বিকেল ৪টাতে মহদীপুর সীমান্ত দিয়ে সেই অপহৃত জওয়ানকে ফেরত দেয়।

চোরাকারবারীদের মারধোরে গুরুতর জখম বিজয় ভেঙ্কটকে মালদা সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কালিয়াচকের চরিঅনন্তপুর চোরাকারবারের স্বর্গরাজ্য। জমি নিয়ে বিবাদ থাকার জন্য সীমান্তের কয়েকটি জায়গাতে এখনও কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। আর এই ফাঁকা স্থান দিয়েই চোরাকারবারীরা সক্রিয় ছিল! বি এস এফ আরও অভিযোগ করেছে পাচারকারীদের একার পক্ষে এই অপহরণ করা সম্ভব নয়। বি জি বি জওয়ানদের সঙ্গে যোগসাজস রয়েছে চোরাকারবারীদের। অপহরণের সময় পিছনে বি জি বি জওয়ানরা ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত মাসেই বৈষ্ণবনগরের বৈদ্যপুরে দুই বি এস এফ জওয়ানকে হাসুয়ার কোপ মারে পাচারকারীরা। প্রশ্ন উঠেছে, এইভাবে চোরাকারবারীদের দ্বারা ক্রমাগত বি এস এফ জওয়ান আক্রান্ত হওয়ায় তাদের মনোবল কী অটুট থাকবে? কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সীমান্ত সুরক্ষার প্রশ্নে এত উদাসীন কেন? আর জওয়ানদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে কেনই বা তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে?

মুম্বাইয়ের হিংসাত্মক ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মুম্বাইয়ের আজাদ ময়দান ও তার আশপাশের এলাকায় গত ১১ আগস্টের হাঙ্গামা পূর্ব-পরিকল্পিত বলে মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ জানিয়েছে। ইতিমধ্যেই মুম্বইয়ের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা থেকে দাঙ্গার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ২৩ জন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মুম্বাই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের দাবীকে আরও দুটি ঘটনা স্পষ্ট করছে। তিনজন মহিলা পুলিশ কনস্টেবলের অভিযোগ— তারা যখন আজাদ ময়দানের কাছে কর্তব্যরত ছিল, সেসময় দুষ্কৃতীদের একটা দল তাদের শ্লীলতাহানি করেছে। এছাড়া দুষ্কৃতীদের আগুন লাগানো পুলিশ ভ্যানটি থেকে দুটো সেল্ফ লোডিং রাইফেল এবং একটি সার্ভিস পিস্তল চুরি হয়ে গিয়েছে। সিটি কোর্টের নির্দেশে দুষ্কৃতীদের পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হলে জিজ্ঞাসাবাদের সূত্রে জানা যায়, দুষ্কৃতীদের তিনজন স্পর্শকাতর এলাকা বলে খ্যাত ডঙ্গরি, বেহেরামপদা ও কুরলা এলাকার। ইতিমধ্যে পুলিশ এদের বিরুদ্ধে ৩০২ (খুন), ৩৫৪ (মহিলাদের শ্লীলতাহানি) ও সরকারি সম্পত্তিহানির ধারায় মামলা দায়ের করেছে। এই দাঙ্গায় ২ জন নিহত ও ৬৫ জন আহত হয়। এই দাঙ্গার পেছনে কি উদ্দেশ্য ছিল পুলিশ এখন তা খুঁজে দেখছে। অসমের জাতিদাঙ্গা ও মায়নামারে মুসলিমদের হত্যার প্রতিবাদে আজাদ পার্কে যে সভার আয়োজন করা হয়েছিল, দুষ্কৃতীরা সেই ভীড়ের মধ্যে মিশে ছিল বলে তদন্তে জানা গেছে।

আবার স্কুলপাঠ্যে যৌনশিক্ষা

নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ ২০০২ সালে সিপিএম পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকার বিদ্যালয় স্তরে যৌনশিক্ষার নামান্তরে জীবন শৈলী শিক্ষার প্রচলন করেছিল। এজন্য সিলেবাস তৈরি এমনকী বইপত্রও ছাপানো হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষক সমাজের আন্দোলনের ফলে স্কুল স্তরে যৌন শিক্ষার পাঠক্রম প্রত্যাখ্যাত হয়। বর্তমানে সংস্কৃতির ধ্বজাধারী তৃণমূল সরকার স্কুল পাঠক্রমে আবার অন্তর্ভুক্ত করতে চলেছে যৌনশিক্ষাকে। এবিষয়ে রাজ্যের তরফে সবুজ সংকেতও মিলেছে। কেন্দ্রীয় সংস্থা 'কবসে'র (কাউন্সিল অব বোর্ডস অব স্কুল এডুকেশন) প্রস্তাব মেনেই নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠক্রমে যৌনশিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এবিষয়ে পাঠক্রমের প্রাথমিক খসড়া তৈরির কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায়শই যৌন হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে কিশোর বয়সের পড়ুয়াদের। মূলত এবিষয়ে সচেতনতার অভাবেই তাদের নিগ্রহের শিকার হতে হচ্ছে বলে মনে করছে কবসে। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি মুক্তিনাথ চট্টোপাধ্যায় অবশ্য বলেছেন, বিষয়টি পড়া বাধ্যতামূলক হলেও এক্ষেত্রে পরীক্ষায় বসতে হবে না পড়ুয়াদের। তবে স্কুলশিক্ষায় যৌনশিক্ষার প্রচলন করে ছাত্রছাত্রীদের সুকুমারবৃত্তি নষ্ট করার পরিপন্থী এরাজ্যের শিক্ষকমহল। তাঁদের মতে যৌন হয়রানি বন্ধ করার প্রচেষ্টা না করে পাশ্চাত্য ভাবধারায় যৌনতা উপভোগের ব্যবস্থা করা হচ্ছে সরকারি উদ্যোগে।

আর যে সরকার দিনরাত সংস্কৃতি প্রসারে গলা ফাটাচ্ছে তারাই আবার স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা আমদানি করছে। এই পাঠক্রম ভারতীয় সংস্কৃতির বিরোধী বলেই তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

সংবাদ প্রতিবেদন

পুস্তক প্রকাশকে কেন্দ্র করে অনর্থক টাকা খরচের অভিযোগ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গতবছর ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তিন খণ্ডে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ওপরে যে গবেষণালব্ধ সচিত্র বই প্রকাশিত হয়েছিল, তার জন্য যে বিশাল পরিমাণ অর্থ খরচ হয় তা এখন বড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়েছে। সম্প্রতি তথ্য জানার অধিকার আইনে ইংরেজি দৈনিক দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানতে পেরেছে, তিন খণ্ডের এই বইয়ের পেছনে খরচ হয়েছে ৯৩.১৫ লক্ষ টাকা। এতদিন পর্যন্ত সেনাবাহিনীর 'প্রকাশন প্রকল্প'-এর আওতায় যাকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ব্যয় বলে অনুমান করা হচ্ছে। লেখক কুণাল ভার্মা জেনারেল ভি কে সিং থেকে জেনারেল বিক্রম সিং-এর আমলে রক্ষী পরিবর্তনের তথ্যগুলির দিকে আঙুল তুলেছেন। লিখেছেন তাঁর এই প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে (ফেজ দুই) প্রাক্তন সেনাপ্রধান গত ৩১ মে কার্যালয় ত্যাগের পর যে জ্বলন্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতি আলোকপাত করবেন। এই ট্রিলজি-র দ্বিতীয় পর্যায়ে সমস্ত খণ্ড স্বদেশীয় ভাষায় অনূদিত হবে এবং দেশজুড়ে স্কুলগুলিতে বিতরিত হবে বলে জানানো হয়েছে। এর জন্য আনুমানিক খরচ ধরা হয়েছে ৩০ কোটি টাকা, বই ছাপানো হবে ১০,০০০ সেট।

কিন্তু গোল বেঁধেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের আধিকারিকরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এই প্রকাশনের জন্য ইতিমধ্যে যে বিশাল অর্থ খরচ হয়ে গিয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তথ্য জানার অধিকার বলে আরও জানা গেছে, বই প্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে অন্তত ৬টি জায়গায় এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫০,০০০ টাকা করে ব্যয় করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এও জানা গিয়েছে, অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত থাকার জন্য সবক'টিতেই একা ভার্মার জন্যই খরচ হয়েছে ২৫,০০০ টাকা। জেনারেল ভি কে সিং এর মধ্যে তিনটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। যার মধ্যে নতুন দিল্লিতে সেনাদিবস এবং কলকাতায় তাঁর অবসর গ্রহণের আগে ১৯ মে-র অনুষ্ঠানও পড়ে।

তথ্য জানার অধিকার বলে জানা যাচ্ছে, এব্যাপারে সেনাবাহিনীর বক্তব্য, এই বইগুলি ভারতীয় সেনাবাহিনীর উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে তুলে ধরার প্রয়াস হিসেবেই রচিত হয়েছে। কৌশলগত অঙ্গ হিসেবে এবং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এধরনের সাহিত্য প্রকাশের প্রয়াস বলে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। প্রশ্ন সেখানে নয়, সেনাবাহিনীর সদুদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ না থাকলেও খরচের ব্যাপারটা ঠিক স্বাভাবিক নয় বলেই তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা। যদিও ভার্মা মনে করছেন, প্রাপ্য সুযোগের তুলনায় যৎসামান্য বেশি খরচা বড়জোর হতে পারে।

তাঁর হিসেব, মোট ব্যয়ের ৯০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৫৭ লক্ষ টাকাই দিতে হয়েছে ছাপাখানাকে, ৬০০০ সেট ছাপানোর জন্য। সেইসঙ্গে যোগ করেছেন তিনি এবং যেহেতু একাজে তাঁর সহকর্মী স্বয়ং সহধর্মিণীই, তাই দু'জনে মিলে পাক্কা ৩ বছর একাজে সময় ব্যয় করেছেন। অর্থাৎ তাঁদের পারিশ্রমিকের ব্যাপারটাও রয়েছে। প্রসঙ্গত, বইটির সহলেখক শ্রীমতী ভার্মা। শ্রীভার্মার আরও দাবি, এই অর্থ সমস্ত সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখে সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা দপ্তরের 'পারসেপশন ম্যানজমেন্ট ফান্ড' থেকে এসেছে।

বার্ষিক গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে বিশেষ আবেদন

ডাকযোগে যাঁরা স্বস্তিকা নেন, তাঁরা প্রতি কপির উপরে কাগজে লেখা গ্রাহক নম্বর এবং মেয়াদ শেষের তারিখ দেখে সেই অনুসারে মেয়াদ শেষের এক মাসের মধ্যে মনিঅর্ডার কিংবা অন্য উপায়ে পরবর্তী বছরের নবীকরণের জন্য গ্রাহক মূল্য পাঠিয়ে রসিদ সংগ্রহ করবেন। পুরনো গ্রাহকরা অবশ্যই গ্রাহক নম্বর লিখে পাঠাবেন। যদি কোনও কারণে নবীকরণ করা সম্ভব না হয় তাও সত্বর স্বস্তিকা কার্যালয়ে জানাবেন। নতুনদের ক্ষেত্রে পুরো নাম-ঠিকানা (পিন সহ) ও টাকা পাঠিয়ে রসিদ নেবেন।

□□ □□ □

যাঁরা এজেন্টদের মাধ্যমে স্বস্তিকা পেয়ে থাকেন, তাঁরা তাঁদের বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদের তারিখ এজেন্টের কাছে জেনে নিয়ে এক মাসের মধ্যে এজেন্টের মাধ্যমে নবীকরণের টাকা জমা করে তার মাধ্যমেই রসিদ সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে নবীকরণ সম্ভব না হলে এজেন্টদের মাধ্যমে কার্যালয়ে জানাবেন। পুনরায় যখন গ্রাহক মূল্য জমা দেবেন সেই সময় থেকে পত্রিকা আবার চালু করা হবে। এজেন্টের সঙ্গে সবদিক থেকে সহযোগিতা ও যোগাযোগ রাখতে পারলে ভালো। সর্বত্রই গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন। আপনার নিকটবর্তী এজেন্টের সঙ্গে সম্পর্কের জন্য তার ফোন নম্বর সংগ্রহ করে রাখা ভালো। উল্লেখ্য, স্বস্তিকা থেকে এজেন্টকে গ্রাহকদের তালিকা পাঠানো হয়ে থাকে।

—ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

সর্বহারার দল সিপিএম কর্পোরেট দুনিয়া থেকে অর্থ সংগ্রহে চতুর্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কর্পোরেট সংস্থাগুলির থেকে টাকা আদায়ের তালিকায় চতুর্থ স্থান দখল করেছে সিপিএম। সর্বহারার দল সিপিএমের সম্পাদক প্রকাশ কারাটের প্রকাশ্য অবস্থানকে সর্বৈব মিথ্যে প্রমাণ করে দিল নির্বাচন কমিশন। কর্পোরেট দুনিয়া থেকে টাকা কড়ি সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে কংগ্রেস, বিজেপি, বি এস পি-র ঠিক পরেই চতুর্থ স্থানটি অর্জন করার গৌরব (?) ছিনিয়ে নিল সিপিএম। নির্বাচন কমিশনের সঙ্কলিত তথ্য অনুযায়ী এই চাঞ্চল্যকর সংবাদটি প্রকাশ্যে এসেছে।

সংবাদসূত্র অনুযায়ী বাস্তবে কর্পোরেট দুনিয়ার সঙ্গে গলাগলির জন্য অনেকক্ষেত্রেই নিন্দিত সমাজবাদী পার্টি ও শরদ পাওয়ারের এন

সারণী

২০০৭-০৮ অর্থবর্ষ	
গায়ত্রী প্রোজেক্টস লিমিটেড, হায়দ্রাবাদ—	৫ লক্ষ টাকায়।
সিউ কনস্ট্রাকশন সাইমগধা রিয়েল—	৫ লক্ষ টাকায়।
২০০৮-০৯ অর্থবর্ষ	
সিউ ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড—	২৫ লক্ষ টাকায়।
জি কে সি প্রজেক্টস—	৩ লক্ষ টাকায়।
২০০৯-১০ অর্থবর্ষ	
নুজিভেদু সিডস লিমিটেড—	১০ লক্ষ টাকায়।
হেটেরো ড্রাগস—	৬ লক্ষ টাকায়।
এ এস আর কনস্ট্রাকশন—	২ লক্ষ টাকায়।

সি পি। এখন সিপিএম এক্ষেত্রে এদের অনেকটাই পেছনে ফেলে দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া সংখ্যাতথ্য অনুযায়ী ২০০৮ থেকে ২০১২ অর্থ বছরে দল ৩৩৫ কোটি টাকা আদায় করেছে। তুলনামূলকভাবে ওই একই সময়ে সমাজবাদী পার্টি ও এন সি পি-র সংগ্রহ যথাক্রমে মাত্র ২০০ কোটি ও ১১০ কোটি টাকা। অনেকটাই নগন্য।

সম্প্রতি সিপিএম সম্পাদক জনমানসে নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাব হারানোর কারণ হিসেবে কর্পোরেট জগতের দরাজ হাতে তথাকথিত বুর্জোয়া দলগুলিকে অর্থ সাহায্যের কারণকেই দায়ী করেছিলেন।

প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী আলোচ্য পাঁচ বছরে প্রত্যাশিত ভাবেই কংগ্রেস ১৬৬২ কোটি টাকা সংগ্রহ করে তালিকার শীর্ষে রয়েছে। এর পরেই আছে বি এস পি ১২২৬ কোটি ও বিজেপি ৮৫২ কোটি টাকা। চাঁদা আদায়ের এই হিসাব সংগৃহীত হয়েছে আয়কর দপ্তরে দাখিল করা রাজনৈতিক দলগুলির বাৎসরিক রিটার্নের ভিত্তিতেই। আয়কর দপ্তরের অধীনস্থ এই হিসাব যোগাড় করেছে 'Association for Democratic Reforms'। রাজনৈতিক দলগুলির দাখিল করা হিসাবপত্র বিশ্লেষণ করে তথ্যাভিজ্ঞ মহল জানিয়েছে অন্যান্য তথাকথিত বুর্জোয়া দলগুলির সঙ্গে সিপিএমের প্রচুর সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন সব দলই দাতাদের পরিচয় গোপনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছে। এই গোপনীয়তার হার অনেক ক্ষেত্রেই ৯০ শতাংশ কোথাও বা প্রায় ৯৯ শতাংশ। এই পরিপ্রেক্ষিতে সিপিএমের অবস্থান সব থেকে অপরিচ্ছন্ন। অবশ্য বি এস পি-র অর্থদাতাদের পরিচয় পুরোপুরি চেপে যাওয়ার ঠিক ওপরেই। উল্লেখ্য ২০০৭-০৮ ও ২০০৮-০৯ এই দুটি অর্থবর্ষে সিপিএম মাত্র ১ শতাংশ দাতার নাম-ধাম প্রকাশ করেছে। তুলনামূলকভাবে আলোচ্য দুটি অর্থবর্ষে বিজেপি ২০ শতাংশ ও ১৪ শতাংশ দাতার নাম জানিয়েছে। এই তালিকায় কংগ্রেস মাত্র ৪ শতাংশ ও ৬ শতাংশ নাম প্রকাশ করলেও তারা সিপিএমের মতো নজরে পড়া লুকোছাপা করেনি।

লক্ষ্য করার বিষয় আলোচ্য পর্বে (০৭-০৮, ০৮-০৯) সিপিএম পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল দু' রাজ্যেই ক্ষমতায় ছিল। (সারণী দ্রষ্টব্য)

নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে দাতাদের যে ছিটে ফোঁটা তালিকা সিপিএম দাখিল করেছে তারই বর্ষানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত তালিকা সারণীতে তুলে দেওয়া হলো।

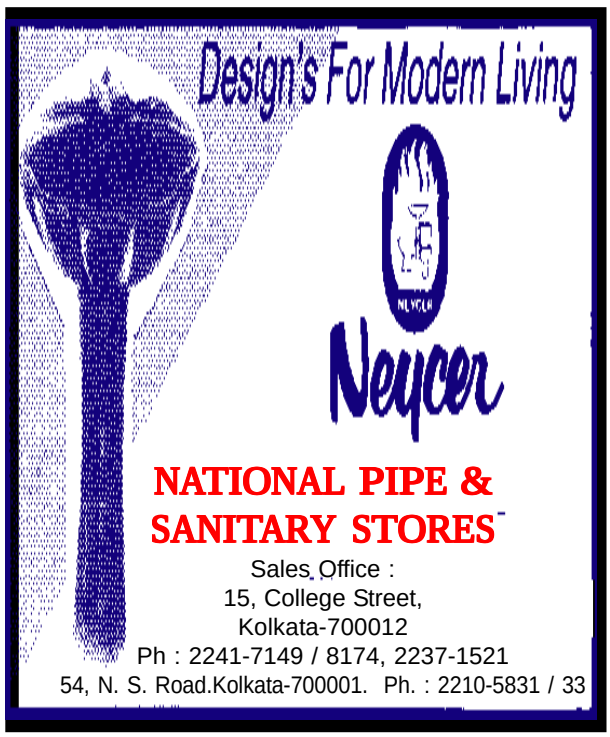

সর্বস্তরেই কোণঠাসা সি পি এম নেতৃত্ব

নিশাকর সোম

সিপিএমের খুবই দুর্দিন যাচ্ছে। একদিকে পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তরের রিসার্চব্যুরোর আহ্বায়ক প্রসেনজিৎ বসুকে বহিষ্কারের পর পার্টির তরফ থেকে ছড়ানো কুৎসায় বলা হচ্ছে--- প্রসেনজিৎ বসু গোপন তথ্য কম্পিউটার থেকে সিডি, পেন ড্রাইভে ভরে নিয়ে গেছেন। প্রসেনজিৎবাবু সেকথা অস্বীকার করে বলেছেন, পার্টিনেতৃত্ব চরিত্রহননের পথেই গিয়ে থাকেন। পরিকল্পনামাফিকই এটা করা হয়। পার্টির স্বার্থেই বহিষ্কৃত পার্টিকর্মীর ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করা হয়ে থাকে।

প্রসেনজিতের বক্তব্য সঠিক। অতীতে দেখা গিয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি যাকে বহিষ্কার করতো তাঁর বিরুদ্ধে 'পুলিশের চর', মহিলা-সংক্রান্ত 'নৈতিক অধঃপতনের' অভিযোগ প্রচার করা হোত।

সিপিএমের বিভিন্নস্তরে এক হতাশা এবং নিস্ক্রিয় অবস্থা দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার নেতা প্রাক্তন সাংসদ শমীক লাহিড়ী রাজনৈতিক প্রাঙ্গণ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন।

শুধু পার্টি নয়, পার্টি পরিচালিত গণ সংগঠনগুলিও নিস্ক্রিয় হয়ে পড়েছে।

সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশ, পার্টি পরিচালিত গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের ৪০ হাজার সদস্য কমে গেছে। এর কারণ হলো— (১) অতীতে ঘরে বসে ভোটার তালিকা দেখে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের সভ্যপদের রসিদ কাটা হোত এবং সম্পূর্ণ টাকাটা একজন ব্যপারীর কাছ থেকে 'চাঁদা' তোলা হোত। এখন সে অবস্থা নেই। সে রামও নেই— সে অযোধ্যাও নেই।

রাজ্য সিপিএম সংগঠন বস্তুত কোমায় চলে গেছে। শুধু রাজ্য নয়— কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। প্রসেনজিৎ-এর বক্তব্য দলের সাধারণ সম্পাদক কারাত অ্যান্ড কোম্পানীকে বিপদে ফেলেছে। কেরলেও প্রকাশ ব্যর্থ।

অপরপক্ষে তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী জঙ্গলমহল, অযোধ্যা পাহাড় অঞ্চল-এ প্রশাসনিক সভা করছেন। সেই সভাগুলির একটি চিত্র হলো--- জনসমক্ষে জেলাশাসক-কে বসিয়ে রেখে মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন— 'বিজ্ঞানমেলা হয়েছিল?' এরপর জনসাধারণকে প্রশ্ন করলেন মুখ্যমন্ত্রী— 'এখানে বিজ্ঞানমেলা হয়েছিল?'

জনতা মুখ্যমন্ত্রীকে জবাব দিল— 'না, বিজ্ঞানমেলা হয়নি— ডি এম মিথ্যা কথা বলছেন।' এইভাবেই জনতার সামনে জেলাশাসক-কে লাঞ্ছনা করা হচ্ছে। এইভাবে জিজ্ঞাসাবাদে প্রশাসনের প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট হচ্ছে না? আসলে জেলা-প্রশাসনকে পঙ্গু করে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সরকারি কাজে হস্তক্ষেপ করে নিজেকেই প্রতিষ্ঠা করছেন। এভাবে চললে একদিন প্রশাসন বলতে কিছুই থাকবে না।

এদিকে 'ত্রিফলা ফলক'-এর আলো এখন ত্রিশূল হয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ধাক্কা দিচ্ছে। ট্রাইডেন্ট-এর ফাইল মুখ্যমন্ত্রীর হেফাজতে আটকে রাখা হয়েছে। এই ট্রাইডেন্টের 'বেআইনি' কাজকর্মের সঙ্গে নাকি মুখ্যমন্ত্রীর আত্মীয়স্বজন জড়িয়ে গেছে?

ট্রাইডেন্ট-এর বিশদ ঘটনা হলো--- ট্রাইডেন্ট বসানোর সময় ২৫ লক্ষ টাকার বাজেট হলে টেন্ডার কমিটিতে পাশ করাতে হয় এবং মেয়রের অনুমোদন লাগে। এই লাইট পোস্ট বসানোর সময়ে সেই নিয়ম অমান্য করা হয়েছে। ৫ লক্ষ করে টাকা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। টেণ্ডার না ডেকে অফিসে নোটিশ ঝুলিয়ে বরাত দেওয়া হয়েছে ১২ হাজারের মতো ট্রাইডেন্ট— ২২ কোটি টাকা খরচ— ৫৪০টি বিল।

পুরসভার এন্টালি ওয়ার্কশপে তৈরি ট্রাইডেন্ট পড়ে আছে। সেখানে খরচ হয় ৩১৫০ টাকা। আর বাইরে থেকে আনতে খরচ ৫৯১৮ টাকা। সল্টলেক পুরসভা- এর থেকে কম খরচে বসাচ্ছে মেয়র পরিষদ সদস্য। মালজার ইকবাল বলেন, "এসব ফালতু অভিযোগের কোনও জবাব দেব না।" নতুন পুর কমিশনার চুপ থাকছেন। আলাপনবাবুকে এসব কারণেই পুর কমিশনার পদ থেকে সরানো হয়েছে?

ইতিমধ্যে প্রাক্তন 'তরমুজ' সুব্রত মুখার্জি ধীরে ধীরে স্থির নিশ্চিত ভাবে ২নং পদে উন্নীত হচ্ছেন। মমতার পরিবর্তে বিধায়কদের নির্দেশ দিচ্ছেন সুব্রত মুখার্জি। অন্যদিকে সিপিএমের নিচের তলার কর্মীদের কাছে বিরোধী নেতা সূর্যকান্ত মিশ্রের প্রভাব বাড়ছে।

সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্বকে অস্বীকার করে পূর্ব-মেদিনীপুর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীতে লক্ষ্মণ শেঠ এবং তাঁর অনুগামীদের স্থান করে দেওয়া হলো। শোনা যাচ্ছে— সিপিএমের রাজ্য-নেতৃত্ব-কে অস্বীকার করে তমালিকা শেঠ পন্ডাকে পুরসভার চেয়ারপার্সন করা হয়েছিল।

একদিকে যেমন এইরকম বিদ্রোহ সিপিএম অভ্যন্তরে হচ্ছে, ঠিক তেমনি রাজ্য-সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্য-সরকারি কর্মচারী সংগঠনেও তীব্র ক্ষোভ-বিদ্রোহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এজি বেঙ্গলের ১৬ এপ্রিলের রিপোর্টে জানা গেছে রাজ্য-সরকার তিন হাজার কোটি টাকার খরচের হিসেব দেয়নি।

এমনকি ৮,৮৯৯টি লেনদেন পেমেন্ট বিল, ভাউচার এবং টেন্ডার ছাড়াই করা হয়েছে। ২০১১-১২ আর্থিক বছরে কৃষি দফতর ৭৩ কোটির ৪ লক্ষ টাকা, কৃষিবিপণন দফতর ১৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা, অনগ্রসর উন্নয়ন দফতর ১৮ কোটি ৪ লক্ষ টাকা এবং সমবায় দফতর ৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার কোনও হিসেব দেয়নি। আলোচনা ছাড়াই ১৪টি গুরুত্বপূর্ণ দফতর-এর ব্যয়বরাদ্দ গিলোটিনে পাস করানো হয়েছে।

দুধ না খেলে মাওবাদী ছেলে

মাননীয়

পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ

সব চিঠিই আপনাদের কাছে পৌঁছোয় জানি। তবু এবার আলাদা করে আপনাদের কিছু জানানো দরকার। মানে এটা সতর্ক করার চিঠি। প্লিজ সাবধানে থাকবেন।

কেন এই সতর্কতা? সেটা আগে বরং বলে দেওয়াই ভাল।

রাজ্যে এখন 'দুষ্টু' কথার প্রতিশব্দ মাওবাদী। দিদির বোন শাঁওলি মিত্র এখন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির মাননীয় সভাপতি। খুব শীঘ্রই তাঁরা অভিধান এবং সমার্থশব্দকোষে এই সংযোজনটা করে ফেললে অবাক হবেন না।

মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বেলপাহাড়ি ভ্রমণের সময়েই ওই কাণ্ড। সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই করব, সেই করব, চাকরি দেব, বাকরি দেব গড় গড় করে বলে যাচ্ছেন। এমনটা তিনি করেই থাকেন। আর সেই সময় রাজ্যবাসীর দস্তুর হলো হাততালি দিয়ে যাওয়া। যারা সমাবেশে গিয়েছেন, তারা তো হাততালি দেবেনই সেই সঙ্গে যারা টিভিতে বসে মমতাবাণী শুনছেন তাদেরও করতালি দেওয়াই কর্তব্য। পারলে দু'বাহু তুলে ধেই ধেই নেত্য করাও উচিত।

কিন্তু ওই ধ্যাড়ধ্যাড়ে গোবিন্দপুর বেলপাহাড়ির ওই যুবকের কি আস্পর্ধা ভাবুন! মঞ্চে সপার্ষদ মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলছেন। তিনি বলছেন মানেই কাজ হচ্ছে। মানসচক্ষে দেখুন ব্লকে ব্লকে হাসপাতল, দারুণ গদি আঁটা বিছানা, ধবধবে চাদর, নার্স, ডাক্তার। দেখুন ব্লকে ব্লকে হিমঘর, কিষাণমাণ্ডি, আইআইটি, পলিটেকনিক। পাড়ায় পাড়ায় স্কুল, ঘরে ঘরে চাকরি। অনাহার নেই। দু'টাকা কেজি চাল এতই মিষ্টি যে নুন তরকারিও লাগে না।

আপনারা দেখতে পান কিনা জানি না, আমি তো দেখতে পাই। চোখ বুজলেই দেখতে পাই এক বছরে একশ কাজ কমপ্লিট করে ফেলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এহেন পরিস্থিতিতে এক গাঁইয়া যুবক কিনা প্রশ্ন করল! ভাবা যায়! তাও আবার কাকে? মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বাংলার প্রথম বাঘিনীকে! অগ্নিকন্যা তো অগ্নিশর্মা হবেনই। এতে আর অবাক হওয়ার কী আছে?

মমতা তখন ভাষণ দিচ্ছেন। হঠাৎ ওই যুবক সভা মঞ্চের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়তে শুরু করেন। একের পর এক কৃষক মারা যাচ্ছেন। ফাঁকা বুলিতে কাজ হবে না। কী ব্যবস্থা নিয়েছেন?

কথাগুলো কানেও গিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। দীর্ঘদিনের রাজনীতিক মমতা একটা বিষয় ভাল জানেন যে প্রতিবাদ জিনিসটা বড্ড ছোঁয়াচে। কেউ শুরু করলেই দোহার দেওয়ার লোকের অভাব হয় না। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ থেকেই মমতা পুলিশকে বলেন, কয়েকজন মাওবাদী সভায় ঢুকে গোলমাল পাকাতে চাইছে। ওই ছেলেটা তাদের একজন। ওকে ধরুন।

দিদি মানে ম্যাডাম মানে রাজ্যের অল ইন অল বলেছেন যখন তখন কি আর চুপ করে থাকা যায়! সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের মধ্যে থেকে টেনে বের করা হয় ওই যুবককে। সংবাদমাধ্যম স্বাভাবিকভাবেই ছবি তোলার চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ থেকে দিদির নির্দেশ, কেউ ছবি তুলবেন না। ওদের গুরুত্ব দেবেন না। ব্যাস শাটার বন্ধ। ক্যামেরা বন্ধ।

হুঁ হুঁ বাবা, একেই বলে নির্দেশ। যাই হোক পুলিশ তো ধরে নিয়ে গেল। মঞ্চেই উপস্থিত আই জি পশ্চিমাঞ্চল গঙ্গেশ্বর মিশ্রকে বলেন যুবককে আটক করা হোক। এরপরে সভামঞ্চ থেকেই জনতার উদ্দেশে বলেন, আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। আগে থেকেই আমার কাছে খবর ছিল, চার পাঁচ জন মাওবাদী সভায় ঢুকে দুষ্টুমি করার চেষ্টা করবে। আমি ওদের চিনি। মুখ দেখলেই বুঝতে পারি। দেখলেন তো ওদের একজনকে কেমন ধরিয়ে দিলাম।

বিশ্বাস করুন পাঠক-পাঠিকারা, সেদিন আমার গর্বে বুক ভরে গিয়েছিল। এমনিতেই আমার গর্বের অন্ত নেই। আপনারাও এটা ভেবে গর্বিত হোন যে এমন একটি রাজ্যে বাস করেন তার মুখ্যমন্ত্রী একাধারে, রাজনীতিক, বাগ্মী, অনশনে পারদর্শী, সঙ্গীতজ্ঞ, কবি, ঔপন্যাসিক আরও কত কী! তিনি লঞ্চ চালাতেও জানেন, রাজ্য চালাতেও জানেন। এবার গর্বে বুক ফেটে গেল এটা ভেবে যে গোয়েন্দাগিরিতেও তিনি ফেলুদা, আগাথা ক্রিস্টি এমনকি শার্লক হোমসকেও টেক্কা দিতে পারেন। অপরাধী ধরতে তাদের কত কসরৎ করতে হয় আর দিদি ভিড়ের মধ্যে শুধু গলা শুনে আর চোখ দেখেই সনাক্ত করে ফেললেন!

সমালোচকরা বলছেন, একদিন দিদি বলতেন মাও-ফাও কিছু নেই। এখন সর্বত্র মাওবাদীর ভূত দেখছেন। বলছেন, সত্যি কথা বললেই সে মাওবাদী। এর আগে প্রেসিডেন্সি কলেজের একটি মেয়ে সর্বভারতীয় টিভি অনুষ্ঠানে অন্য সুরে প্রশ্ন করে মাওবাদী বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন। এবার ওই গ্রাম্য যুবকের পালা। প্রশ্ন করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। রাজ্যে পুলিশ-রাজ চালু হতে চলেছে। এসব কথায় কিন্তু কান দেবেন না। আপনার গায়ে মাওবাদী তকমা না লাগাতে চাইলে চায়ের দোকান থেকে ট্রেনের ভিড় কোথাও এসব নিয়ে মুখ খুলবেন না।

প্রথম দিন পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে শিলাদিত্য চৌধুরী নামে ওই যুবকের সঙ্গে মাওবাদী সংস্রব খুঁজে না পেয়ে ছেড়ে দেয়। কিন্তু দু'দিন পরই শিলাদিত্যকে বিনপুরের নয়াগ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয়। তখন সে মাঠে চাষ করছিল। এখন বলা হচ্ছে, সেদিন তাঁকে ছাড়া হয়নি। পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর হাই সিকিউরিটি ভেঙে ঢোকা এবং পুলিশকে গালিগালাজ করার জন্য। তবে পুলিশের হাত থেকে পালাল কী করে সেটা কিন্তু কেউ জানতে চাইবেন না।

যাই হোক, এবার রাজ্য সরকার কতগুলো নিয়ম চালু করলে অবাক হবেন না। ১। কোনও শিশু দুধ না খেতে চেয়ে দুষ্টুমি করলে সে মাওবাদী। ২। স্কুলে শিক্ষক জানেন না এমন বেয়াদপ প্রশ্ন করলে সে মাওবাদী। ৩। কাজের দাবিতে কোনও বেকার মুখ খুললে ডবল মাওবাদী। ৪। 'কলকাতা লন্ডন হইতে পারে না, দার্জিলিং সুইজারল্যান্ড হইতে পারে না' ইত্যাদি বলে রাজ্যের ভাবমূর্তিতে আঘাত করলেই মাওবাদী তকমায় ভূষিত করা হবে।

সাবধানে থাকুন।
সতর্ক থাকুন।
ভাল থাকুন।

—**সুন্দর মৌলিক**

গণিতজ্ঞ এস রামানুজমের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী

সংবাদদাতা॥ সম্প্রতি দিল্লীতে বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ শ্রীনিবাস রামানুজমের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হলো। উদ্যোক্তা শিক্ষা সংস্কৃতি উত্থান ন্যাস। উল্লেখ্য, ভারত সরকার রামানুজম-এর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ ২০১২ সালটিকে জাতীয় গণিতবর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে। ন্যাস সারা বছর ধরে এই উপলক্ষে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম করবে বলে স্থির করেছে। ইতিমধ্যে দিল্লীতে ২৬ থেকে ২৮ জুলাই একটি আলোচনাচক্র হয়ে গিয়েছে যেখানে দিল্লীর ৪০ জন ছাত্র এবং এন সি আর অংশগ্রহণ করে। গণিতের বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন। সি বি এস ই-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিনীত যোশী এই আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ভিপি শ্রীবাস্তব, অধ্যাপক ধর্মপ্রকাশ, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ মনমোহন সিং অরোরা, ডঃ অতুল নিশ্চল, ডঃ কৈলাস বিশ্বকর্মা, বি এম আগরওয়াল, শ্রীমতী শুচি গোয়েল প্রমুখ।

এই কার্যক্রমের ছিল তিনটি পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে ছিল গাণিতিক কলাকৌশল, বৈদিক গণিত, আই সি টি নৈপুণ্য, সৃষ্টিশীল বিদ্যা। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল গণিতের সমস্যার চ্যালেঞ্জ আর তৃতীয় পর্যায়টা ছাত্র ও শিক্ষকদের কাজকর্মের প্রদর্শনের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছিল।

স্বামীজীর সার্ধশতবর্ষে আর এস এসের পুস্তিকা প্রকাশ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘও অন্যান্য সকল সংগঠনের মতোই দেশব্যাপী আগামী বছর (২০১৩) জানুয়ারি থেকে জানুয়ারী ২০১৪

পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের সার্ধশতবর্ষ পালন করবে। সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ শাখা এই উপলক্ষে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। বইটির শীর্ষক হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণে স্বামী বিবেকানন্দ ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। গত ৫ আগস্ট সকাল ১১টায় কেশব ভবনে এক অনুষ্ঠানে বইটি প্রকাশ করেন সঙ্ঘের সর্বভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ শ্রী হস্তীমলজী, প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাস সহ প্রদেশের অনেক কার্যকর্তা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, আগামী জানুয়ারী মাসের ১১-১২-১৩ কল্যাণীতে 'বিবেকানন্দ যুবশিবির' অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

ত্রিনিদাদে সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ

সংবাদদাতা॥ এই প্রথম ভারতের বাইরে কোনও দেশে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ২১ দিন ব্যাপী সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ হয়ে গেল। গত ১৫ জুলাই ত্রিনিদাদের চিন্ময় আশ্রমে দ্বিতীয় বর্ষের সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ হয়ে গেল। ৬টি দেশ থেকে ৫৮ জন শিক্ষার্থী এই বর্গে অংশগ্রহণ করেন। দেশগুলি হলো— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, কেনিয়া, সুরিনাম, গায়ানা ও ত্রিনিদাদ। সঙ্ঘের সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী এই শিক্ষাবর্গ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন।

চিন্ময় আশ্রমের স্বামী প্রকাশনন্দ এই বর্গের উদ্বোধন করেন। এই বর্গের সর্বাধিকারী ছিলেন গায়ানার স্বামী অক্ষরানন্দ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকার সেবা ইন্টারন্যাশনাল-এর সহ সভাপতি অরুণ

ভাইয়াজী যোশী

কুলকার্ণী। মানব সেবার গুরুত্ব বর্ণনা করে স্বামী প্রকাশানন্দ বর্গের শিক্ষার্থীদের সেবাকাজে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন জানান। হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ত্রিনিদাদ ও টোবাগো-র সঙ্ঘচালক দেওরূপ তিমাল-ও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। যেসব স্বয়ংসেবক নিজের নিজের দেশে সাতদিনের তিনটি প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরাই এই বর্গে অংশগ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। যোগ, নিযুদ্ধ (ক্যারাটে), সমতা (কুচকাওয়াজ)-এর মতো শারীরিক এবং বৌদ্ধিক ছিল এই প্রশিক্ষণ বর্গের কার্যক্রমের অঙ্গ।

হিন্দু সংস্কৃতি, যুবকদের কাছে চ্যালেঞ্জ, যোগাযোগের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ইত্যাদি ছিল আলোচনার বিষয়। সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ শ্রীকান্নন, অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক প্রমুখ ভাগাইয়াজী, ডঃ রাম বৈদ্য প্রমুখ সঙ্ঘের অধিকারীরাও এই শিক্ষা বর্গ পরিচালনায় সাহায্য করেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের দুই ধারা

ডঃ নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত

ডঃ বিদ্যাধর মহাজন প্রমুখ পণ্ডিত-ব্যক্তিরা দাবি করেছেন— গান্ধীজীই ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন।

কিন্তু বলা দরকার— স্বাধীনতা কখনও ব্যক্তিবিশেষের অবদান হতে পারে না। অগণিত মানুষের ত্যাগ স্বীকার, দুঃখবরণ, মৃত্যু ও অশ্রুর বিনিময়ে একটা জাতির স্বাধীনতা আসে— সেটা একটা যৌথ প্রয়াসের সফল সৃষ্টি।

এই কথাটা ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। গান্ধীজী অবশ্যই ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে একটা অনন্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা এসেছে অগণিত মানুষের এক অনুপম সংগ্রামের মধ্য দিয়ে— এটা আদৌ একক প্রয়াসের ব্যাপার নয়।

দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে গান্ধীজী চম্পারণের আন্দোলনে একটা অনবদ্য নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু তারও পরে ১৯২১ সালে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে এক সর্বভারতীয় সংগ্রামের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

বলাবাহুল্য তাঁর নেতৃত্বে সংগ্রামের ধরন-ধারণই আমূল বদলে গিয়েছিল। এতকাল কংগ্রেসের আন্দোলন ছিল মূলত নগর-কেন্দ্রিক, তাতে প্রাধান্য ছিল উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের। কিন্তু গান্ধীজীর সেই ডাকে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ একটা সংগ্রামী রূপ নিয়েছিল— সাড়া এসেছিল দেশের সব দিক থেকে, এসে দাঁড়িয়েছিলেন সর্বসাধারণ। বলা চলে এমন এক জননেতা এর আগে আদৌ দেখা যায়নি। ডঃ বিপান চন্দ্র, ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী ও ডঃ বরুণ দে তাঁদের 'স্ট্রাগল' গ্রন্থে লিখেছেন— 'A wave of unprecedented enthusiasm swept the country, the high and the how, man and women, Hindus and Muslims, the conservatives, the radicals and the liberals all alike were affected' (পৃ. ১৩৬)। শত নির্যাতন ও অত্যাচারেও সত্যাগ্রহীদের দমানো যায়নি। দেখতে দেখতে বন্দীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৬০ হাজার। অদ্ভুত ব্যাপার হলো— অগণিত নারীও সব সঙ্কোচ ও ভয়কে জয় করে পুলিশের মুখোমুখি হয়েছেন।

অবশ্যই এই অভিনব আন্দোলন ছিল অহিংসা ও অসহযোগ ভিত্তিক। তাঁর অস্ত্র ছিল 'অহিংসা', 'অসহযোগ' ও 'সত্যাগ্রহ'। তাঁর তত্ত্ব অনুসারে স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা হিংসাত্মক আচরণই করতে পারবেন না, তাঁরা সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করবেন এবং হবেন 'সত্যাগ্রহী'— অর্থাৎ তাঁদের চোখে শত্রু কেউ নেই, আছে 'প্রতিপক্ষ'— তাদের হৃদয় পরিবর্তিত করতে হবে দুঃখবরণের মধ্য দিয়ে, আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত করে নয়। ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে— 'Conquer him by love. Suffer punishment even into death for disobeying his will.' আরও বড় কথা— 'Oppose tyranny, but never hurt the tyrant'— (মহাত্মা গান্ধী পৃ. ৮৫)। এই কারণে চৌরীচৌরাতে আহতক্রুদ্ধ মানুষ বাইজন পুলিশকে হত্যা করায় গান্ধীজী তাঁর আন্দোলন প্রত্যাহার করেছিলেন।

১৯৩০ সালে আইন-অমান্য আন্দোলনে অহিংস জন-জোয়ার আরও বড় আকার নিয়েছিল। এতে জেলবন্দী হয়েছেন লক্ষাধিক সত্যাগ্রহী, হাজার হাজার নারীও এতে অংশ নিয়েছিলেন। সার কথা হলো— পুলিশী অত্যাচার ক্রমে নারকীয়তায় পৌঁছেছে। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন—'রেইন অফ টেরর'। এমন কি বৃটিশ পার্লামেন্টের ডেলিগেশন এসে এই বর্বর পুলিশী সন্ত্রাসকে 'পুলিশরাজ' বলে স্বীকার করেছেন। রিপোর্টের ভূমিকায় প্রখ্যাত মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেল লিখেছেন, ওই বর্বরতা হিট্‌লারের অত্যাচারকেও ছাপিয়ে গেছে (ডেলিগেশন রিপোর্ট)।

কিন্তু মানুষ প্রত্যাঘাত করেননি, অহিংস সত্যাগ্রহী হিসেবেই সেই নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। মার্কিন সাংবাদিক উইল্ড কিলার লিখেছেন, পুলিশের লাঠির ঘায়ে মানুষের মাথার খুলি ফাটার শব্দ শুনে তিনি শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করেছেন— কিন্তু কোনও প্রত্যাঘাতের ঘটনা ঘটেনি।

সূর্য সেন

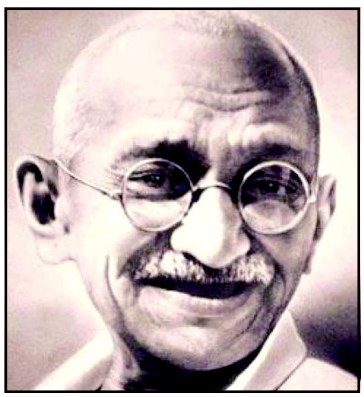

মহাত্মা গান্ধী

ক্ষুদিরাম বোস

এই ধরনের গণ-আন্দোলন কোথাও ঘটেছে বলে আমাদের জানা নেই। কিন্তু এর পাশাপাশি আরেক ধরনের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল গান্ধী যুগের আগে থেকেই। সেটা হলো সশস্ত্র সংগ্রাম--- বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের (১৯০৫) সময় থেকে এই সংগ্রামের ধারা পরিপুষ্ট হয়েছে এবং সেটা অব্যাহত ছিল দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে। তাতে ছিল চারটে স্তর— (১) গুপ্ত হত্যা, (২) সম্মুখ সংগ্রাম, (৩) ব্যাপক অভিযান এবং (৪) মহাযুদ্ধের রূপান্তর।

কিংস্‌ফোর্ডকে মারতে গিয়ে ধৃত ক্ষুদিরাম ফাঁসিতে প্রাণ দিয়েছেন, প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করেছেন। গোপীনাথ সাহা হত্যা করতে চেয়েছিলেন অত্যাচারী পুলিশ-কমিশনার টেগার্টকে, তাকেও ফাঁসিতে প্রাণ দিতে হয়েছে। রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে পুলিশ হাসপাতালের মধ্যে হত্যা করে কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসু ফাঁসিতে প্রাণ দিয়েছেন। ভগৎ সিং, শুকদেব প্রমুখ বিপ্লবীও তেমন করে মৃত্যুবরণ করেছেন। কানাইলাল ভট্টাচার্য হত্যা করেছেন বিচারক গার্লিকে। বারো/তেরো বছরের শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী গুলি করে মেরেছেন ম্যাজিস্ট্রেট স্টীভেন্সকে। সরকারি উকিল আশু বিশ্বাসকে গুলি করে হত্যা করেছেন চারুচন্দ্র বসু। ইন্সপেক্টর সামস্-উল-আলমকে গুলি করেছেন ধীরেন গুপ্ত। মেদিনীপুরের তিন ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ, ডগলাস ও পেডি নিহত হয়েছেন। ভবানী ভট্টাচার্য দার্জিলিংয়ে গুলি করেছেন ছোটলাট অ্যান্ডারসনকে।

এই ধারা চলেছে বাংলার বাইরেও। চন্দ্রশেখর আজাদ প্রমুখ বিপ্লবীরা আতঙ্কিত করে তুলেছিলেন বিদেশী শাসকদের।

দ্বিতীয় স্তরে ছিল সম্মুখ সংগ্রাম। কালারপুলের যুদ্ধ, বুড়িবালামের তীরে বাঘা যতীনদের সংগ্রাম, চট্টগ্রামের জালালাবাদে মাস্টারদার বাহিনীর গুলি বিনিময় এই ধারার উজ্জ্বল উদাহরণ।

তৃতীয় স্তরে ঘটেছে সশস্ত্র অভিযান। রাইটার্সে বিনয়-বাদল- দীনেশের অভিযান, চট্টগ্রামে ইউরোপীয়ান ক্লাবে প্রীতিলতা ওয়েদ্দেদারের নেতৃত্বে সশস্ত্র আক্রমণ ইত্যাদি ঘটনা বুঝিয়ে দিয়েছে যে বিপ্লববাদ গুপ্ত হত্যার স্তর ছাড়িয়ে চলেছে ব্যাপক অভিযানের দিকে।

মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীরা জানতেন যে, দু-চারজন অফিসারকে হত্যা করলে বা খণ্ডযুদ্ধে জয়ী হলেই এত বড় দেশের সরকার ভেঙে পড়বে না বা দেশ থেকে বিদায় নেবে না। কিন্তু তাঁরা অহিংস বা নিরস্ত্র প্রতিবাদের নীতিতে আস্থা না রেখে খুঁজেছেন বিকল্প পথ। যাঁরা অনায়াসে প্রাণ দিয়েছেন, নিয়েছেনও। মৃত্যুর অমৃতপথে পা বাড়িয়ে তাঁরা দেশবাসীকে জীবন ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন।

অবশ্যই এই সব মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীরা জানতেন যে, দু-চারজন অফিসারকে হত্যা করলে বা খণ্ডযুদ্ধে জয়ী হলেই এত বড় দেশের সরকার ভেঙে পড়বে না বা দেশ থেকে বিদায় নেবে না। কিন্তু তাঁরা অহিংস বা নিরস্ত্র প্রতিবাদের নীতিতে আস্থা না রেখে খুঁজেছেন বিকল্প পথ। যাঁরা অনায়াসে প্রাণ দিয়েছেন, নিয়েছেনও। মৃত্যুর অমৃতপথে পা বাড়িয়ে তাঁরা দেশবাসীকে জীবন ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন। তাই তাঁরা ফাঁসীর রজ্জুকে হাসিমুখে ফুলের মালার মতো গলায় পরেছেন— 'কে বা আগে প্রাণ করিবেক দান, তার লাগি কাড়াকাড়ি।'

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, গান্ধীজীর বড় অবদান হলো— তিনি জাতির ভয় ভেঙে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিপ্লবীরা আরও বড় কাজ করেছেন--- তাঁরা ভয়কে জয় করতে শিখিয়েছেন। সেই ভীতিহীন, মৃত্যুহীন দেশপ্রেমই ক্রমে দেশের অগণিত মানুষকে ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের পথে নামিয়ে এনেছে— শুরু হয়েছে এক ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী মহাসংগ্রাম। ঘটেছে নৌ-বিদ্রোহ— সৈনিক ও সাধারণ মানুষের রক্ত ঝরেছে একসঙ্গে। নেতাজী বিপ্লববাদকে চতুর্থ স্তরে নিয়ে গেছেন— সশস্ত্র সংগ্রাম মিশেছে মহাযুদ্ধের সঙ্গে। দেশের ভেতরে ২৭০ মাইল ঢুকে পড়েছে আজাদ হিন্দ বাহিনী। এই দুই ধারার মিলিত প্রয়াসই ঘটিয়েছে দেশের স্বাধীনতা। গান্ধজী ১৯৪২ সালে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'-র ডাক দিয়েছেন। কিন্তু অধিবেশনের সময় তিনি বলেছেন, আন্দোলনকে অহিংস রাখতেই হবে। অথচ তাঁরা কথা শুনেছে কে? আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তিনি— কিন্তু আন্দোলন চলে গেছে হিংস্র সংঘাতের দিকে। ধ্বংস, হত্যা, দহন,ব্যারিকেড তৈরি করে সংগ্রাম, লুণ্ঠন— কি বাকি ছিল? ডঃ নিমাইসাধন বসু লিখেছেন— 'Naturally, the movement took the form of a violent outbreak'—(দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট, পৃ. ১২৫)। আর ডঃ পি. এন. চোপ্‌রার ভাষায়— 'the movement took a violent turn'— (ইন্ডিয়া'জ স্ট্রাগল্ ফর ফ্রীডম, পৃ. ২৮)। আজাদী সেনাপতিদের মুক্তির ব্যাপারেও দেখা গেছে সেই বিধ্বংসী উন্মাদনা। কোথায় তখন উবে গেছে গান্ধীজীর অহিংসা-সত্যাগ্রহের মন্ত্র। নেহরুর হিসেবে আগস্ট বিপ্লবে হতাহত হয়েছেন হাজার দশেক মানুষ। আর নৌ-বিদ্রোহে অগণিত নাবিক প্রাণ হারিয়েছেন, মারা গেছেন অন্তত ২৭০ জন সাধারণ মানুষও।

এইসব কারণেই বলা যায়— স্বাধীনতার পেছনে ছিলেন অগণিত মানুষ আর সংগ্রামের দুটো ধারা মিশে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে।

দেশভাগ ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ : ঘটনা ও পটভূমি

বাসুদেব পাল

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ বিদেশীদের দ্বারা বারবার আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু কখনও পদানত হয়নি। সর্বদাই সংঘর্ষ করে চলেছে। আলেকজান্ডার খৃস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে ভারত আক্রমণ করার দুঃসাহস করেন। কিন্তু তাকে অত্যন্ত বিফল মনোরথ হয়ে ফিরতে হয়। চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের দৃঢ়তায় গ্রীকদের আর কোনও চিহ্নই থাকেনি।

প্রথম খৃস্টাব্দের শতাব্দীতে শক আর ৫ম শতাব্দীতে হুণেরা ভারত আক্রমণ করে। উত্তর ভারতে ব্যাপক অত্যাচার করলেও মিহিরগুল এবং তোরমান টলমল করতে থাকে। এদের পরাজিত করেন হর্ষবর্ধন, যশোধর্মণ, বিক্রমাদিত্য এবং শালিবাহনসহ অনেক মহাবীর যোদ্ধারা। সপ্তম শতাব্দীতে ব্যাপকহারে মুসলিম আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। মহম্মদ গজনী একাদশ শতাব্দী এবং মহম্মদ ঘোরী দ্বাদশ শতাব্দীতে আক্রমণ করে। ৮০০ বছর ধরে হিন্দুস্থান এবং হিন্দুজাতি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য সতত সংঘর্ষ করেছে।

রাজস্থানে মহারানা কুম্ভ, মহারানা প্রতাপ সিংহ, রাজসিংহ, দক্ষিণ ভারতে হরিহর ও বুক্ক, কৃষ্ণদেব রায়, মহারাষ্ট্রে ছত্রপতি শিবাজী ও পেশোয়ারা, পাঞ্জাবে গুরু গোবিন্দ সিংহ সহ সকল শিখ বলিদানী গুরু, বান্দা বৈরাগী, রণজিৎ সিংজী, বুন্দেলখণ্ডে বীর ছত্রশাল, অসমে লাচিৎ বরফুকন, প্রমুখের প্রবল প্রতিরোধের মুখে ইসলাম ভারতবর্ষের মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে।

মৌলানা হালীর কবিতা—

উহ দীনে হিজাজী কা বেবাক বেড়া
নিশাঁ জিসকা অক্সায়ে আলম মেঁ পঁহুচা,
মজঁহম হুয়া কই খতরা ন জিসকা,
ন অম্মা মেঁ ঠটকা ন কুলজম মেঁ ঝিঝকা,
কিয়ে পে সিপর জিসনে সাতোঁ সমুন্দর,
উহ ডুবা দহানে মেঁ গঙ্গা মে আকর।

জিন্না, জওহরলাল ও মাউন্টব্যাটেন বৈঠক।

রাষ্ট্রীয় পুনর্জাগরণ :

শুধু রণাঙ্গণেই নয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী রামতীর্থ, মহর্ষি রমণ, যোগী অরবিন্দ, প্রমুখ মনীষী সাংস্কৃতিক পরম্পরার জাগরণ করে সনাতন ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতিকে অমরত্ব প্রদান করেন। স্বামী বিবেকানন্দ- পাশ্চাত্যে 'সাইক্লোনিক হিন্দুমংক' নামেই পরিচিত হন।

সমাজসংস্কারে রাজা রামমোহন রায়, কেশব চন্দ্র সেন, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, মহাত্মা ফুলে, ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভাবে সাফল্য আসে। ভারতবর্ষব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রাম — জ্বালামুখী আগ্নেয়গিরির লাভার মতো দেশপ্রেমের উদ্গীরণ হতে থাকে।

রামসিং কুকা, বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে, বীর সাভারকর, চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগত সিং, রাসবিহারী বোস, বি বি এস আয়ার। লোকমান্য তিলকের নেতৃত্বে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিলকের বিখ্যাত উক্তি— ''স্বরাজ জন্মসিদ্ধ অধিকার''। মহাত্মা গান্ধীর জন্য মঞ্চ তৈরি হলো, বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রেম ও আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণ করেন। দেশকে জগজ্জননী মা দুর্গার সঙ্গে সমান স্বরূপে উপস্থাপন করেন। গান্ধীজীর চরকার মাধ্যমেও দেশপ্রেম জাগরণ, লবন আন্দোলন, জঙ্গল সত্যাগ্রহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

বন্দেমাতরম্ রচিত হয় ১৮৭৫ সালে। ১৮৮২-তে আনন্দমঠ উপন্যাসে তা যুক্ত করা হয়। সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ বৃটিশ রাজশক্তিকে উচ্ছেদ করতে এগিয়ে আসে। অহিংস ও সহিংস দু'পথেই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হারতে হারতে ইংরেজরা জিতে যায়। পুলিশ এবং প্যারা-মিলিটারি ফোর্সের মধ্যেও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে।

১৯৪৭-এর ১৪-১৫ আগস্টের মধ্যরাত্রি (ইংরেজী মতে রাত বারোটার পরে তারিখ বদল হয়)। কয়েক মিনিট আগেই ভারতের

প্রথম প্রধানমন্ত্রী ভাববিভোর হয়ে জাতি তথা দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তৃতা— "অনেক বছর আগে আমরা যে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সংকল্প করেছিলাম... ঠিক অর্ধরাত্রে সারা সংসার যখন শুয়ে আছে, ভারত জীবন এবং মুক্তির আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াবে। এরকম লগ্ন ইতিহাসে কখনও কখনও আসে। যখন একটা যুগ সমাপ্ত হয়ে, পুরাতন যুগ ছেড়ে নতুন যুগে প্রবেশ করে। তখন কোনও রাষ্ট্রের চিরদমিত আত্মা মুখর হয়ে ওঠে।" কিছুক্ষণের মধ্যেই অমাবস্যার কালো মেঘ কেটে গেলো— রাত বারোটা পার হতেই স্বাধীন ভারতের সূর্যোদয়— ৩১টি তোপধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানানো হলো।

কিন্তু এই ঐতিহাসিক ঘটনার কিছু আগেই ইতিহাস আর একটি বাঁক নিয়ে নিয়েছে— ভারতের মাটিতে বলা ভালো ভারতমায়ের অঙ্গচ্ছেদ করে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে ভারতের স্বাধীনতার ২৪ ঘণ্টা আগেই। ভারতকে চিরে দু' টুকরো করা হয়েছে— আসলে তিন টুকরো। এটা কি নেহরু তথা কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামী আদৌও সাজিয়ে রেখেছিলেন?

এক ব্যথা, বিচ্ছেদ, হাহাকার মর্মন্তুদ আর্তনাদ অত্যাচারের সীমাহীন ঘটনা। 'সুন্দর স্বপ্ন' শুধুই ভণ্ডামি অবাস্তব। এই বিয়োগান্ত নাটকের কথা জানতে হলে তার পাত্র-পাত্রীদের কথাও জানতে হবে।

যে কংগ্রেস উঠে চুকে বুকে গেছে সেই ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের (বর্তমান কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৮-৭৯ সালে) ১৯২৯-৩০ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন জওহরলাল নেহরু। ৩১ ডিসেম্বর মাঝরাতে তিনি দেশবাসীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করিয়েছিলেন। সাক্ষী রাভী নদীর জল এবং জাতীয় পতাকা। আজকের স্বাধীন ভারতে সেই রাভী নদীই নেই। যে লাহোরে সেই শপথ গ্রহণ হয়েছিল সেই লাহোরে আজ ভারতবাসীদের জন্য কোনও স্থানই নেই, ভারতের মানচিত্রের বাইরে। প্রথম প্রথম যখন মুসলিম লীগ 'পাকিস্তান দাবী' তুলেছিল তখন নেহরু তাকে পাগলের প্রলাপ (Fantastic Nonsense) বলে উপহাস করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর মহাত্মা গান্ধী— ১৯৪০-এ মুসলিম লীগ 'পাকিস্তান' প্রস্তাব গ্রহণ করার পর তাঁর হরিজন পত্রিকায় লিখেছিলেন— দো রাষ্ট্র কা সিদ্ধান্ত বেতুকা হ্যায়... জিন্হে ভগবান নে এক বনায়া হ্যায়, উন্হে মনুষ্য কভী বাঁট সকেগা?

বঁটবারে কা অর্থ হ্যায় সচ্চাই সে মুঁহ মোড়না। মেরী সমুচী আত্মা ইস বিচার সে বিদ্রোহ কর রহী হ্যায়। মেরে বিচার মেঁ এ্যায়সে সিদ্ধান্ত কো স্বীকার করনা ঈশ্বর কো নকারনা হ্যায়। ম্যায় হর অহিংসাত্মক উপায় সে ইসে রোকুঙ্গা, কিউঁ কি ইসকা অর্থ হ্যায় এক রাষ্ট্র কে রূপ মেঁ সাথ সাথ রহনে কে লিয়ে অনগিনত হিন্দুয়োঁ অর মুসলমানোঁ নে সদিয়োঁ সে জো পরিশ্রম কিয়া হ্যায়, ওসপর পানী ফের দেনা।"

আরেকজন প্রমুখ কংগ্রেসী ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ— তিনি ১৯৪৫-এ জেলে থাকাকালীন একটি বই লেখেন— 'India Divided' নামে। সেখানে তিনি যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন পাকিস্তানের দাবী সর্বতোদৃষ্টিতে অব্যবহারিক তা--- সে, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, আর্থিক অথবা রক্ষণাত্মকই হোক না কেন। পরে উনিই স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হন।

লীগের প্রস্তাবের পরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর পক্ষে তাদের ওই বিষয়ে মতামত বা দৃষ্টিকোণ স্পষ্ট করার প্রয়োজন ছিল। মহামনা মালবীয়জী একটু দ্বিধাগ্রস্ত হলেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় আর এস এস প্রতিষ্ঠতার সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন। উনি গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করলেন। এটা ১৯৪০ সালের কথা। গান্ধীজী ওনার মতো মহান ব্যক্তিকে আশ্বাস দিলেন কোনও অবস্থাতেই দেশভাগ হতে দেব না। তবে মালবীয়জী চেয়েছিলেন কংগ্রেস এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করে দেশবাসীকে জানিয়ে দিক। এরই ফলশ্রুতি ১৯৪২ সালে এলাহাবাদ অধিবেশনে উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত জগতনারায়ণ একটি প্রস্তাব আনলেন। যার শিরোনাম ছিল— "অখণ্ড হিন্দুস্তান প্রস্তাব।" যা গৃহীত হয়। ওখানে দেশের অখণ্ডতার প্রতি কংগ্রেস স্পষ্ট শব্দে নিজেদের বিশ্বাস ব্যক্ত করে দেশভাগের সবরকম বিরোধিতা করার অঙ্গীকার করেছিল। জানুয়ারি ১৯৪৬-এ সিদ্ধান্তমূলক নির্বাচন হয়। যা আগামী দিনে অদূর ভবিষ্যতে দেশের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। এমনটাই ভাবা হয়েছিল। ততদিনে বোঝা গিয়েছিল ক্রুর ইংরেজ ভারত ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। প্রত্যেক চিন্তাশীল দেশবাসীর কাছে প্রশ্ন এদেশ অখণ্ড থাকবে তো। অথবা দেশভাগ হবে?

রাজনৈতিক ময়দানে দুটি প্রধান পরস্পরবিরোধী দল— কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ। লীগ মুসলমান ভোটারদের 'পাকিস্তান' সৃষ্টির কথা বলে ভোট চাইল। কংগ্রেস দেশের অখণ্ডতা রক্ষার দাবী করে জাতির মতামত চাইল।

লীগ মুসলমান প্রধান এলাকায় ব্যাপক ভোট পেল। হিন্দুরা কংগ্রেসকে বিশ্বাস করে দেশের অখণ্ডতার কংগ্রেসকেই ভোট দিল নিঃসঙ্কোচে। নতুন ভাইসরয় হয়ে এলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। ৩ জুন, ১৯৪৭ যখন ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা হলো তখন স্তব্ধ অবাক নির্বাক হয়ে গেল। কেননা নেহরু ও সর্দার প্যাটেলের অনুমোদন ক্রমে সেই সিদ্ধান্তে ভারত ভাগ ও পাকিস্তান গঠনের কথা পাকা হয়ে গেছে। তখনও মানুষ বিশ্বাস করতে চাইছিল না কংগ্রেস এতটা নীচে নেমে বিভাজন মেনে নেবে। কিন্তু ১৫ জুন পর্যন্ত সব আশা শেষ হয়ে গেল। সেদিন অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি বিভাজনে সীলমোহর দিয়ে ফেলেছে।

১৯৪৭-এর ১৪-১৫ আগস্ট মধ্যরাত্রে যা হলো বা হয়েছিল তা ছিল জাতির প্রতি সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতা। বিশ্বাসঘাতকতা হলো তাদের সঙ্গে যাঁরা দেশের একতা অখণ্ডতা ও স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব পণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবনমৃত্যু তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন, জেলে ছিলেন, জেল খেটেছেন।

ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে করাচী রওনা হওয়ার আগে শ্রী প্রকাশ গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। গান্ধীজী অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন— "আমার জীবনের স্বপ্ন শেষ, জীবনের ধ্যেয় মাটিতে মিলিয়ে গেল।"

ভারত ভাগের চুক্তিতে— (একে চুক্তি বলাটাই ঠিক) কেননা, এটা ত্রিপাক্ষিক

সমঝোতা। ধূর্ত ইংরেজদের চালে মাৎ পদলোভী ক্ষমতালোভী সংগ্রামবিমুখ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ। ফলে সর্বত্র রক্তের নদী বওয়ার অমানবিক ক্রূর নিষ্ঠুরতার বর্বরতার পৈশাচিকতার পাশবিক ইসলামি প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হলো। একদল প্রস্তুত। অন্যদের কোনও উপায়ই নেই। কোনও ভাবনা চিন্তাই নেই। নেতাদের কথায় বিশ্বাস করে ধনেপ্রাণে সম্মানে মারার মরবার ব্যবস্থা পাকা।

পট্টভি সীতারামাইয়া ইন্ডিয়ান নেশনল কংগ্রেসের ইতিহাস লিখেছেন— 'ক্ষোভ-বিক্ষোভকে বের করে দেওয়ার জন্যই লর্ড হিউমকে দিয়ে ইংরেজরাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেছিল'।

ওয়াহাবি আন্দোলন—১৭০৩-১৭৬২ : যখন ইসলামী শাসন শেষ হয়ে এসেছে তখনই শাহ বলীউল্লা দেহলবী ভারতীয় মুসলমানদের কট্টর পুনরুত্থানবাদী ওয়াহাবি আন্দোলন সূত্রপাত করেন। তার পুত্র আব্দুল আজিজ (১৭৪৬-১৮২২) ঘোষণা করে দেন, ভারত ইসলামী সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য দারুল হারব অর্থাৎ যুদ্ধরত দেশ। যা আমরা এখনও দেখতে পাই। ১৮৩০ এই পেশোয়ার সৈয়দ আহমদ-এর ৮০,০০০ ওয়াহাবি সেনা প্রস্তুত হয়।

ইংরেজরা মুসলমানদের বলত— তোমরা সম্রাট, এদেশ তোমাদের ছিল। হিন্দুরা কাফের, তোমাদের দাস। আগা খাঁ ১৯০৬-এ প্রতিনিধি-মণ্ডল নিয়ে সিমলাতে লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ঢাকাতে নবাব সলিমুল্লার নেতৃত্বে প্রমুখ মুসলমানদের এক সম্মেলন হয়। ৩০ ডিসেম্বর ১৯০৬ অখিল ভারতীয় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। লাল ইস্তাহার বিলি করা হলো। ৪ মার্চ ১৯০৭ কুমিল্লায় দাঙ্গা। নবাবের লোকেরাই দাঙ্গা করে।

২৩ মার্চ ১৯৪০ লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রস্তাব পাস করে।

১৯৪২ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল একটি যোজনা তৈরি করে যুদ্ধকালীন মন্ত্রীমণ্ডলের সদস্য স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপসকে ভারতে পাঠান, যাকে ক্রীপস্ মিশন বলা হয়।

(১) ঔপনিবেশিক স্বরাজ। গভর্নর জেনারেল কার্যকারিণী গঠন।

(২) উপনিবেশ হিসেবে ভারতের সংবিধানসভা গঠন।

(৩) প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যকে উপনিবেশ এর বাইরে থাকার ছাড় দেওয়া হবে।

১৯৪২-এ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন-কে বৃটিশ-লীগ-কম্যুনিস্ট মোর্চা— সবাই মিলে ছুরিকাঘাত করে। ১৯৩৯-এ হিটলার স্ট্যালিনের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন। কিন্তু ১৯৪১ জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করে, তখন ভারতীয় কম্যুনিস্টরা নিষ্ঠাপূর্বক ইংরেজদের সেবায় লেগে যায়। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ রাতারাতি জনযুদ্ধ বা 'পীপলস্ ওয়ার'— এ পরিণত হয়। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির মহাসচিব পি সি যোশী ১৯৪২, ১৯৪৩, ১৯৪৪ এর সংকটময় পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের গৃহসচিব রোজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েলের মধ্যে যে পত্রালাভ করেন তা অনেকদিন আগেই বেরিয়ে কম্যুনিস্টদের মুখোশ খুলে দিয়েছে।

নৌবিদ্রোহের পর তিন সদস্যের ক্যাবিনেট মিশন— পথিক লরেন্স, এ বি আলেকজান্ডার এবং স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ ভারতে আসেন।

অ্যাটলির হাউস অব্ কমন্সে ঘোষণা থেকেই বোঝা যায় ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে।

১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট লীগের ডায়রেক্ট অ্যাকশন-এর দিন সুরাবর্দী ছুটি ঘোষণা করেন।

সিন্ধু ও পাঞ্জাবে পুলিশের ৭০ শতাংশ মুসলমান। বাংলায় ছিল ৫০ শতাংশ মুসলমান।

১৬ আগস্ট সকালেই বিরাট মিছিল বের করল মুসলিম লীগ। লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান, নারায়ে তকদীর, আল্লাহো আকবর, তিনদিনেই দশহাজার মৃত— ১৫০০০ ভয়ঙ্কর ক্ষত বিক্ষত। সবাই হিন্দু। দেশভাগকে ত্বরান্বিত করেছিল ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট তথাকথিত গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং এবং ১০ অক্টোবর নোয়াখালিতে নির্বিচার হিন্দু হত্যা।

Direct Action—প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তুতি :

- বাইরে থেকে ব্যাপক সংখ্যায় মুসলমান আমদানি করা হয়েছিল।
- বেলগাছিয়া, রাজাবাজার, কলাবাগান বস্তি, ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, ধর্মতলা, পার্ক সার্কাস, এন্টালি প্রভৃতি এলাকায় বেশ কিছুদিন আগে থেকে অস্ত্রে শান দিতে দেখা গেছে।
- একই সাইজের ছোরা বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে। উদাহরণ : ২০০৭ ২১ নভেম্বর পার্ক সার্কাস ৪নং ব্রীজের কাছে তসলিমা বিতাড়নের দাবীতে একইরকম বিক্ষোভ।
- বি টি রোডে লাঠি, ছোরা, তরোয়াল ভর্তি লরি দেখা গেছে।
- ১৫ আগস্ট মানিকতলায় ক্যানাল ওয়েস্ট রোডে রাত্রে অস্ত্রশস্ত্র ভর্তি ঠেলাগাড়ি দেখা গিয়েছে।
- হত্যাকাণ্ডে কসাইখানার কসাইদের সক্রিয় ভূমিকা দেখা গেছে।
- In Rajabazar boys were found sharpening weapons.
- In Lalabagan Basti found sharpening daggers and knives on 15th August.
- A number of houses in Dharmatala St. were reserved for goondas.
- On a search in Belgachaia area a large number of Swords, lathis and daggers were recovered (after the riot).
- In Khidirpore area a large number of Swords and daggers were recovered after riot.
- Muslim shops were marked 'Pakistan'.
- Instructions had been issued to several Muslims hostels to make preparation to set fire to tram cards and military lorries on the 16th.
- During 16th-18th or 19th August. Muslims lorries with lathis and weapons and brickbats were found in Barrackpore Trunk Road. Weapons were stered in 8, Zakaria Street and Nakhoda Maszid.
- All the railings which weere surrounding the Ripon Square had been uprooted and turned into sharp weapons.
- ১৬ আগস্ট ও তার পরে মুসলমানরা বিরাট সংখ্যক লরি কাজে লাগিয়েছিল।
- এ সমস্ত লরির জন্য কলকাতার মেয়র ওসমান, প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী প্রমুখ পেট্রলের ঢালাও কুপন ইস্যু করে ১৫-১৮ আগস্ট পর্যন্ত। তখন পেট্রোলের ভীষণ অভাব চলছিল।

 মুসলমান গুণ্ডাদের লুটপাট ও পরিবহনের কাজে ওই সব লরি ব্যবহৃত হয়।

 কলকাতার মেয়র হেসেবে ওসমান ঢালাও লরির ব্যবস্থা করে। মুসলমান গুণ্ডারা সেসব লরিতে চেপে মনের সুখে লুটপাট, অগ্নি সংযোগ ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যায়।

 মুসলিম লীগ সরকারের চাল সংগ্রহের অন্যতম এজেন্ট ইস্পাহানি তার ব্যবসায়ে নিযুক্ত লরিগুলি মুসলিম লীগ ভলান্টিয়ারদের ব্যবহারের জন্য দেয়। মুসলীম লীগের পতাকা লাগিয়ে ওসব লরি বৌবাজার ও সেন্ট্রাল এভিনিউ-র পেট্রোল পাম্প থেকে জোর করে পেট্রোল আদায় করে।

অস্ত্রশস্ত্র মজুত, লুটপাটের জন্য গাড়ী, কলকাতার গুণ্ডাবাহিনী ছাড়াও বাইরের গুণ্ডাবাহিনী আমদানি করা হয়। ১৫ আগস্ট তাদের ছড়িয়ে দেওয়া হয়। হিন্দুরা যখন নিদ্রাচ্ছন্ন তখন কলকাতার মসজিদগুলিতে সাজো সাজো রব। তা পুলিশ রিপোর্টে পাওয়া যায়।

১৬ আগস্ট মুসলীম লীগ হরতাল ডাকল। সুরাবর্দীর গভর্নমেন্ট ঘোষণা করল সরকারি ছুটি। উদ্দেশ্য সরকারি ও বেসরকারি মুসলমান জনতা যাতে নিজ নিজ এলাকায় সঙ্ঘবদ্ধ থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারে। বেলগাছিয়া থেকে রাজাবাজার পার্ক সার্কাস খিদিরপুর-ওয়াটগঞ্জ-মেটিয়াবুরুজ ও পোর্ট এলাকা ভাগাভাগি হয়ে যায় মুসলমান গুণ্ডাদের মধ্যে।

১৬ থেকেই কলকাতায় লাশের পাহাড় জমতে থাকে।

 Stabbing started al 4.30 A.M.

 Between 6.30-7.30 large number Muslims attacked Manicktala Bazar, two hindu ladies attacked, one gentleman stabbed to death.

মিনিটে মিনিটে লালবাজারে খুন-জখম-হত্যা ও লুটপাটের, অগ্নিসংযোগের ঘটনার খবর আসতে থাকে।

৪-৩০ পি.এম. মেট্রো সিনেমার পাশে কে সি বিশ্বাসে বন্দুকের দোকান ভেঙে মুসলিম জনতা অস্ত্রশস্ত্র লুট করে নেয়।

৪-৪২ ধর্মতলা স্ট্রীটে বিখ্যাত 'কমলালয় স্টোর্স' লুট।

৫-১০-১৫২নং লোয়ার সার্কুলার রোডে লক্ষ্মীকান্ত দাসের সাইকেল দোকান লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত। রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের হিন্দুদের প্রায় সকল বসতবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

১৯৩৩, ২৮ জানুয়ারি চৌধুরী রহমৎ আলি নামে কেম্ব্রিজে পাঠরত এক ছাত্র ও তার তিন

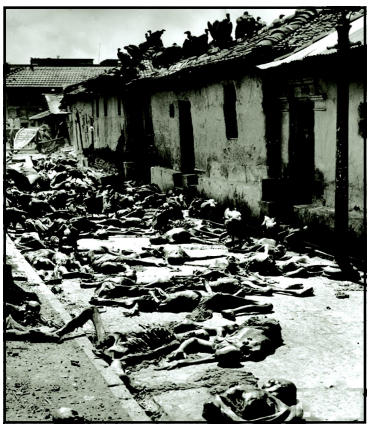

'৪৬-এর কলকাতা— নীচে মৃতদেহের সারি ওপরে শকুনের দল। (ফাইল চিত্র)

বন্ধু— ১৯৩৩ এর জানুয়ারি মাসে ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টির এক পরিকল্পনা গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত মুসলমান নেতাদের সামনে পেশ করে। "in the name of our common heritage and on behalf of our thirty million Muslim brethren, who live in Pakistan by which we mean the five Norther unites of India, viz. Punjab, North-West Frontier Province (Afgan Province), Kashmir, Sindhu and Baluchistan---

আদ্যক্ষর নিয়ে পাঞ্জাবের P, আফগান এলাকার (A), সীমান্ত প্রদেশ (Afgan Pravince), কাশ্মীরের K, সিন্ধুর S. বালুচিস্তানের tan নিয়েই পাকিস্তান। (ইংরেজরা সিন্ধুকে Indus বলত)।

ইকবালের প্রস্তাবে ভারতের মধ্যেই একটা আলাদা এলাকার কথা বলা হয়েছিল। রহমৎ আলি ভারত থেকে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের কথা বলে। সে সকল নেতারা যে প্রস্তাবকে অবাস্তব ও বিকৃত মস্তিষ্ক-প্রসূত বলে আখ্যা দেন সেই নেতারাই মাত্র সাত বছর পরে রহমৎ আলিদের প্রস্তাবকে কাজে পরিণত করেন বলা যায়।

খাদ্য দপ্তরের তৎকালীন সচিব ক্ষিতীশ চন্দ্র চৌধুরীর কথায়— উনি ওই বীভৎস দৃশ্য চাক্ষুষ করেছেন। পরে উনি বিশ্বভারতীতে উপাচার্য ছিলেন। ২২ মার্চ ১৯৪৭ মাউন্টব্যাটেন ভারতে পৌঁছালেন। ২ জুন রাত্রে জিন্না মাউন্টব্যাটেন সমঝোতা হয়ে গেল। ৩ জুন মাউন্টব্যাটেনের কথামতো জিন্না মাথা দোলান। ৩ জুন এবং ১৫ আগস্টের মধ্যে মাত্র ৭২ দিনের ব্যবধান। লেখক লিওনার্ড মোসলের কথামতো ১৯৪৮ এর জুনে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা ইংল্যান্ডে ক্ষমতাসীন লেবার পার্টি ঠিক করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতা এল দশমাস আগে, ফলে ভয়ঙ্কর মারামারি কাটাকাটি।

সুচেতা কৃপালনী, মহাত্মা গান্ধী এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদ অহিংসার পথে চলার পরামর্শ দেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের যুবক স্বয়ংসেবকরা নগর মহল্লা থেকে হিন্দু শিখ বাচ্চা-মহিলাদের ভারতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা রক্ষার ব্যবস্থা করেন। সুরক্ষিত স্থানে পৌঁছানো, খাওয়া, জল, চিকিৎসা, কাপড় প্রদান করা। বিভিন্ন স্থানে অগ্নি-নির্বাপক দল তৈরি। ট্রেনে সুরক্ষা হিন্দু, শিখ এলাকায় দিনরাত পাহারার ব্যবস্থা করেন। প্রমুখ কংগ্রেস নেতারাও নিজেদের পরিবার পরিজনদেরকে স্বয়ংসেবকদের সুরক্ষায় সঁপে দিতেন।

একদিকে শপথ গ্রহণ সমারোহ— লাল কার্পেটের উপর দিয়ে মাড়িয়ে গিয়ে শপথ নিচ্ছেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সর্বত্র উৎসবময় পরিবেশ, একটা দৃশ্য। হাইকম্যান্ডের নির্দেশে দীপাবলীও যেন ম্লান হয়ে যায় এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হতে হবে। আকাশে ইন্দ্রধনু। বর্ষণ। প্রকৃতিও যেন অভিনন্দন জানাচ্ছে— আর অন্যদিকে—

মাইলের পর মাইল লম্বা কাফিলা— লাহোর, মূলতান, লায়লপুর, শিয়ালকোট থেকে হিন্দু-শিখ সবাই পালিয়ে আসছে ভারতে।

লালকেল্লার লোকেদের মতো আনন্দে নয়—

সবকিছু ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসছে ভারতে--- হতাশ নিরাশ সুকুমার স্ত্রী-পুরুষ-শিশু, বালক-বালিকারা গোরুর গাড়ি, মালগাড়ি, যে যা পেয়েছে ঝুলতে

ঝুলতে ১০০ জনের জায়গায় হাজার জন চড়ে বসেছে। গর্ভবতী মহিলা— আসন্ন প্রসবা সবাই আসছে। জঙ্গলে প্রসব করতে বাধ্য, নবজাতককে দেখভাল করার সময় নেই। চোখে জল নিয়ে পালিয়ে আসছে। নিরাপত্তা কোথায়? কেউ হাতড়ে বেড়াচ্ছে সঙ্গী-আত্মীয় পরিজনদের মৃতদেহ। দিনের পর দিন রাস্তায় খাওয়া দাওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে গিয়েছে। শিশুকে কি খাওয়াবে! বাচ্চা কাঁদছে। হয়ত গলা ভেজানোর জন্য যে জল পাওয়া যাচ্ছে তাই দিতে হচ্ছে। মহল্লার পর মহল্লা জ্বলছে। আকাশ পর্যন্ত আগুন। যেদিকে তাকাবেন শুধু মৃতদেহ। দাউ দাউ করে ঘর জ্বলছে, ভিতরে বন্ধ নরনারীর করাল ক্রন্দন। হত-পা-মাথা-কবন্ধের মতো দেহাংশ পড়ে আছে। সেনারা গুলি চালাচ্ছে নির্দোষ নিরস্ত্রদের বুক ভেদ করে দিচ্ছে। মানবতা ত্রাহি ত্রাহি ডাকছে। দানবের অট্টহাস। নির্মমতার কোনও সীমা নেই। নির্লজ্জতাও লজ্জিত। পশুতা মানবতার মুখে থুতু দিচ্ছে।

মহিলাদের উপর সামূহিক বলাৎকার। লুটের মালের মতো নীলাম। সর্বহারা বিধবা হচ্ছে। শিশুরা অনাথ। রেলগাড়ীও সুরক্ষিত নয়। জেহাদিরা হাতিয়ার নিয়ে হামলা চালাচ্ছে— রেলগাড়ীতে লাশ ভরে পাকিস্তান থেকে ভারতে পাঠাচ্ছে। ''আজাদ ভারত কো পাকিস্তান কী তোফা,'' উর্দুতে লেখা— কামরার গায়ে। এই ছবিটা কী ভয়ানক।

১৪ আগস্ট সন্ধ্যায় নেহরু ভোজনে বসেছেন। রয়েছেন কন্যা ইন্দিরা ও পদ্মজা নাইডু। হঠাৎ লাহোর থেকে টেলিফোন। পুরাতন শহরের জল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভীষণ গরমে জলকষ্ট, বাইরে গেলেই সশস্ত্র মুসলমানরা তাকে হত্যা করছে। লাহোর জ্বলছে : (Freedom at Midnight p. 245)।

এটা হঠাৎ করে ভুল হয়ে যাওয়া নয়। জেনে বুঝে করা রণনীতির অঙ্গ। কেউ এই নিষ্ঠুর দৃশ্যকে 'স্বাধীনতার প্রসব যন্ত্রণা' বলেই ক্ষান্ত। সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাজার হাজার স্বয়ংসেবক একনিষ্ঠভাবে ঠিক করেছিলেন— কি করে হিন্দু বন্ধুদের সুরক্ষিত নিরাপদে ভারতে পৌঁছানো যায়। ততক্ষণ কেউ স্থানত্যাগ করবে না।

খদ্দরধারীরা সবার আগে পালাল।

তৎকালীন কার্যকর্তাদের কয়েকজনের নাম

মাধবরাও মূলে— প্রান্ত প্রচারক, পাঞ্জাব।

রায়বাহাদুর বদ্রীদাস দিবান-প্রান্ত সঙ্ঘচালক, পাঞ্জাব।

লালা হরিশচন্দ্র— সঙ্ঘচালক, দিল্লী।

বসন্তরাও ওক— প্রান্ত প্রচারক, দিল্লী।

খানচাঁদ গোপলদাস— প্রান্ত সঙ্ঘচালক-সিন্ধুপ্রদেশ।

রাজপাল পূরী— প্রান্ত প্রচারক-সিন্ধু।

একনাথ রানাডে— ক্ষেত্র প্রচারক পূর্বাঞ্চল।

মনোহর হরকরে— প্রান্ত প্রচারক, বঙ্গপ্রদেশ।

ঠাকুর রামসিং— প্রান্ত প্রচারক, অসম।

সবার মুখে একটাই নাম রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ।

''সঙ্ঘবালে গুণ্ডো সে হমারে বিটিয়া আপস লায়ে''। কেবল পাকিস্তানই নয় সঙ্ঘ না থাকলে অমৃতসর থেকে দিল্লী পর্যন্ত লীগের পতাকা দেখা যেত।

সঙ্ঘের ভূমিকার কথা লিখেছেন
এন এন বালী
'Now It can be told' পুস্তকে
Page-137, 138, 139

'পুরুষার্থ' মাসিক মারাঠী পত্রিকায় শ্রীগুরুজী লিখেছেন--- সেদিন সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা অলৌকিক শৌর্য এবং বুদ্ধিমত্তার দ্বারা অনেক পরিবারকে রক্ষা করেছেন। অনেকে উঁচু পদে কর্মরত। তাঁরা অমৃতসরে আমাকে দেখা করে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে স্বয়ংসেবকদের বীরত্বের কাহিনী বলেছেন। জিজ্ঞাসা করেছেন আপনারা কি শিক্ষা দিয়েছেন? ওরা না হলে আমাদের ছেলেমেয়ে পরিবার এভাবে বাঁচতে পারত না। এদের মধ্যে কয়েকজন আবার সেনা-অফিসার। সে সময়ে পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, দিল্লী এবং জম্মু-কাশ্মীরে সঙ্ঘের কাজ ভালোই ছিল।

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজী ১৯৩৭-এ তিনজন প্রচারককে পাঞ্জাবে পাঠান। এদের মধ্যে কে ডি যোশীকে শিয়ালকোট, দিগম্বর ওরফে রাজাভাউ পাতুরকর লাহোর এবং মোরেশ্বর মুঞ্জে রাওয়ালপিণ্ডিতে নিযুক্ত হন।

২১ জুলাই ১৯৪০-এ নাগপুরের ধন্তোলী শাখা থেকে ২২ জন যুবক প্রচারক বের হন— এঁদের মধে চারজনকে ডাক্তারজীর মাসিক শ্রাদ্ধে পাঞ্জাব থেকে আগত ধরমবীরজীর সঙ্গে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন নতুন সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী। এঁদের মধ্যে মাধবরাও মূলে পাঞ্জাব প্রান্ত প্রচারক হন। অন্যরা বাবুরাও পালধিকর, বাবা কল্যাণী এবং লেখরাজ শর্মা। শর্মাজী পাঞ্জাবী— অন্যরা নাগপুরের। বাবুরাওজী ফিরোজপুর, লেখরাজজী মূলতান এবং বাবা কল্যাণীকে লায়লপুর পাঠানো হয়।

১৯৩৮, ১৯৩৯-এ লাহোর-এ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৮-এ স্বয়ং ডাক্তারজী গেলেও ১৯৩৯-এ অসুস্থতার জন্য যেতে পারেননি। তবে সরকার্যবাহ শ্রীগুরুজী দু'বারই গিয়েছিলেন। ১৯৪২-এ মাধবরাও মূলেজীর ব্যক্তিত্বের চৌম্বকীয় আকর্ষণে এবং শ্রীগুরুজীর আহ্বানে চল্লিশজন স্বয়ংসেবক লাহোর শাখা থেকেই প্রচারক বের হন।

১৯৪০-এ পাঞ্জাবের সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডবাতে অনুষ্ঠিত হয়। অনেকে প্রচারক বের হন। বেদপ্রকাশ শাস্ত্রীজীকে সীমান্ত প্রদেশ, লেখরাজজী শর্মাকে মূলতান, রাওয়ালপিণ্ডিতে ডাঃ হরবংশলাল, লাহোর-এ ভাই মহাবীর, জম্মু-কাশ্মীরে বলরাজ মাধোক, অমৃতসর-এ ঠাকুর রাম সিং নিযুক্ত হন।

১৯৪৭-এ পাঞ্জাবে দুটি স্থানে সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ হয়— সাংরুর এবং ফাগোয়ারার ভোগপুরে। ভোগপুর বর্গের শিক্ষার্থী ছিল— ১৯৩৭ জন। লাহোর ছাড়াও অন্য ৩৩৭ স্থান থেকে স্বয়ংসেবকরা বর্গে যোগ দেন।

সাংরুর বর্গের সংখ্যা— ৬৪৯ জন। মোট ২৫৮৬ জন। বিশেষ কারণে বর্গ দশদিন আগেই ছুটি হয়ে যায়। সমাজ রক্ষা ও সেবার জন্য।

জেনারেল শংকররাও থেরাত-এর স্ত্রী লীলাতাই-তাঁর জবানবন্দীতে সঙ্ঘের প্রশংসা করেছেন মুক্তকণ্ঠে।

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জয়লাল বলেছেন, আরও দশ বছর আগে পাঞ্জাবে কাজ শুরু হলে পুরো পাঞ্জাবই বেঁচে যেত।

কৃতজ্ঞতা : শ্যামাপ্রসাদ ও বঙ্গবিভাগ। ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ। দেশ বঁট গয়া। এইচ ভি শেষাদ্রি। জ্যোতি জ্বালা নিজ প্রাণ কী। মানিকচন্দ বাজপেয়ী।

চিঠিপত্র

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও দুই পক্ষ

দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঘিরে রাজনীতি এতটা দীর্ণবিদীর্ণ ও কর্দমাক্ত মনে হয় এর আগে হয়নি। ভারত হলো পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। নির্বাচন ব্যবস্থা হলো গণতান্ত্রিক জীবনেরই প্রতীক। আর গণতান্ত্রিক দেশের সর্বোচ্চ পদের নির্বাচন কর্দমাক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু এবারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিশেষ করে এরাজ্যের শাসক ও বিরোধী দলের কৌশলসর্বস্ব ও স্বার্থান্বেষী রাজনীতির প্রতিফলন ঘটেছে তা বলা যায়। দুই বিপরীত মেরু রাজনৈতিক দলের একই প্রার্থীকে নিঃশর্ত সমর্থন করা তো বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খাওয়ার সামিল। অর্থাৎ বর্তমান শাসক দলের দুমুখো নীতি প্রকট হয়ে দেখা দিল। জাতীয় রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলের মোকাবিলায় রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের সঙ্গে একই পথের পথিক হতেও দ্বিধাবোধ হয় না বর্তমান শাসক দলের। এঘটনা সংকীর্ণ রাজনীতির সঙ্গেই তুলনীয়। অবশ্য পোড়খাওয়া রাজনীতিক ও গান্ধী পরিবারের ঘনিষ্ঠ নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী দীর্ঘ বাম রাজত্বেও এরাজ্যে কট্টর বামবিরোধী বলে পরিচিত ছিলেন না। আর এ রাজ্যের দিদি যে দাদাকে সমর্থন করলেন তা অবাস্তব নয়। কিন্তু নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি একাধিক লাভজনক পদেও আসীন ছিলেন। আবার এই প্রণব মুখার্জীই জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সম্পর্কে বাংলা তথা দেশভাগ নিয়ে নানা কটূক্তি করেছিলেন। তাহলে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির রাজনৈতিক জীবন নিষ্কলঙ্ক নয়। অথচ রাষ্ট্রপতি পদ হলো সকল রাজনীতির ঊর্ধ্বে দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদ। তিনি হলেন দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক। তাই দেশের এই সর্বোচ্চ পদে একজন বাঙালীর নির্বাচিত হওয়াকে সমর্থন করা যেতে পারে। তাই ব'লে দলের নীতি, আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে তা করা সমীচীন নয়। সে কারণে এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক লড়াই দৃষ্টিকটু লাগে। ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীর এই নির্বাচনে জয়লাভ করাটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু রাজ্যের শাসক দলের নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনে অভিনয় সুলভ মানসিকতাকে সমর্থন করা যায় না। তাঁর দলের ভোটদানে বিরত থাকাটাই শ্রেয় হোত। কিন্তু নির্বাচনে একই প্রার্থীকে রাজ্যের দুই প্রধান যুযুধান পক্ষের সমর্থনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে কি বার্তা পৌঁছাবে? এরপর বামবিরোধী আন্দোলন বড়ই বেমানান দেখাবে না কি? তাই দলীয় নীতি, আদর্শ মূল্যহীনের সঙ্গেই তুলনীয়। তবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র লোকসভা নির্বাচনের মতো জনগণের রায়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হওয়াটাই যথার্থ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। তাহলে গণতন্ত্রের প্রকৃত প্রতিফলন ঘটবে এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনেক সাবলীল হতে পারে।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলী।

হজ-অনুদান

গত ৪৭ সংখ্যার 'স্বস্তিকা'য় চিঠিপত্র বিভাগে অনিল চন্দ্র দেবশর্মা লিখিত পত্রটি পড়লাম। কিন্তু কোনও দিক-দিশা পেলাম না। যেখানে বিকাশ ভবনের এডুকেশন বিভাগ ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আমায় লিখে পাঠিয়েছে, মক্কা ছিল বহু দেবদেবীর মন্দির, সেখানে আমি মাত্র একজন ভারতীয় ব্যক্তিকেও ইসলামি হজ করতে যেতে দিতে রাজী নই। শ্রী দেবশর্মা লিখছেন, ''হজ করতে যতবার খুশী যাক নিজ ব্যয়ে, কারও মাথাব্যথা নেই।'' দেবশর্মা মহাশয়ের স্কন্ধে মাথা আছে তো? ''অন্যায় যে করে আর ...'' অর্থাৎ দেবশর্মা নিজের চিতা নিজেই সাজিয়েছেন নয় কি? আমার স্কন্ধে একটা মাথা আছে বলেই আমার মাথাব্যথা আছে। কেবল হজ অনুদান কেন, হজ এর পেছনে মাত্র একজন ভারতীয় অর্থ ব্যয় পরোক্ষে রাষ্ট্রেরই অর্থ অপচয় নয় কি?

—মৃণাল হোড়, বিন্দুবাসিনী পাড়া, চন্দননগর, হুগলী।

চিনি ব্ল্যাক

মালদা জেলার হরিশচন্দ্রপুরের ভগবানপুরের এক রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে চিনি গ্রাহকদের না দিয়ে বাজারে বিক্রির অভিযোগ পাওয়া গেছে। রেশনের গম যেমন বাংলাদেশে পাচারের অভিযোগে ইতিমধ্যে প্রশাসন নড়েচড়ে বসেছে তেমনি স্থানীয় বাসিন্দারা খাদ্য সরবরাহ দপ্তরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পুলিশ গিয়ে তিন কুইন্টাল চিনি বাজেয়াপ্ত করে। ব্লক প্রশাসন ঘটনার তদন্তে নেমেছে। ক্ষোভের আঁচ পেয়ে রেশন ডিলার খালেক হাসান বাজার থেকে চিনি কিনে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। হরিশ্চন্দ্রপুর ১নং বিডিও সজল তামাং বলেন, বাসিন্দাদের অভিযোগ পেয়েছি— ভগবানপুর ৬৪নং দোকানে বরাদ্দ চিনি উপভোক্তাদের না দিয়ে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছিল। রেশন দোকানের মালিক খালেক হাসান অভিযোগ অস্বীকার করলেও তার বাড়ির ভিতর থেকে তিনবস্তা চিনি কোথায় গেছিল, তার সদুত্তর দিতে পারেনি। প্রশাসন তদন্তে নেমেছে। এদিকে বাসিন্দারা জানান, রেশন নিতে গিয়ে উপভোক্তারা ঘুরে এসেছে, ডিলার জানিয়েছিল চিনি আসেনি।

—তরুণ কুমার পণ্ডিত, কাঞ্চনতার, মালদহ।

নতুন আলোর দিশারী 'স্বস্তিকা'

আমি গত এক বৎসর যাবৎ আপনার পত্রিকার একজন একনিষ্ঠ পাঠক। আমি পত্রিকাটির প্রতিটি অংশ মনোযোগ সহকারে পাঠ করি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি এবারের অর্থাৎ ৩০ জুলাই ২০১২ সংখ্যাটি পাঠ করে আমি খুবই তৃপ্ত। এই সংখ্যায় আমি কেন, আমার মনে হয় সকল দেশহিতৈষী ব্যক্তি যারা সত্যিকারের দেশকে ভালবাসে তাদের প্রত্যেকের কাছে খুবই প্রেরণাদায়ক।

বিশেষ করে শিবাজী গুপ্ত ও নিশাকর সোম মহাশয়ের দেশের প্রাক্-স্বাধীনতা সংক্রান্ত দুর্লভ অর্থপূর্ণ আলোচনা দেশহিতৈষী সকল ব্যক্তিকে আগামীদিনে স্বামীজীর আদর্শ ভারত গঠনের স্বপ্নকে জনমানসে সফল করার প্রেরণা যোগাবে তাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাই আমার মতো স্বস্তিকার পাঠকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্তমান অবক্ষয় ও গণতন্ত্রের যুগে এই পত্রিকা আগামীদিনে এক নূতন দিশা দেখতে সমর্থ হবে— এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

—পাঁচুগোপাল ঘোষ, নরেন্দ্রপুর, হাওড়া।

বোড়ো নেতাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে বিজেপি সঠিক পদক্ষেপই নিয়েছে

ব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

মুসলিম ও বোড়োদের মধ্যে স্বাধীনোত্তর নারকীয়তম হত্যালীলা সংঘটিত হলো। এই সংঘর্ষের জাতিদাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক হানাহানি প্রভৃতি নানান নামকরণ করা হচ্ছে। অসমের কোকরাঝাড়, চিরাং, উদালগুরি ও বাকসা অঞ্চল নিয়ে যে বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল এরিয়া ডেভেলাপমেন্ট ডিস্ট্রিক্ট (বি টি এ ডি) গঠিত হয়েছিল, দাঙ্গা সেই অঞ্চলকে ঘিরেই। তার মর্মন্তুদ বিবরণ সংবাদপত্রে পাওয়া গেছে। এর রাজনৈতিক ফলশ্রুতি হিসেবে বিজেপির আদবানীজী, মুখপাত্র তরুণ বিজয় থেকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রধান তোগাড়িয়া-রা বোড়োল্যান্ডে গেড়ে বসা বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী মুসলিমদের একবাক্যে দায়ী করেছেন। প্রতিবাদে চিরাচরিত ভাবে প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও অসমের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রিকোণ বাহিনী নিরাপদ অবস্থান নিয়ে বিদেশী অনুপ্রবেশের বা তৃতীয় শক্তির দায়টিকে বেমালুম উড়িয়ে দিয়েছেন। ভোট বাজার ঠিকঠাক রাখতে তাঁরা প্রত্যাশা মতোই সঙ্ঘ পরিবারকে এই নরহত্যার সাম্প্রদায়িকীকরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করে ফেলেছেন। সাদাকে সাদা কালোকে কালো তারা কখনও বলতে পারলেন না।

বি টি এ ডি প্রধান হাগরামা মহিলারী বোড়ো পিপিলস ফ্রন্টের সর্বোচ্চ নেতা যারা আবার গগৈ সরকারের শরিক তারাও সরাসরি এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই ঘটনায় বাংলাদেশকে দায়ী করেছে। তাই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে কিন্তু ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে। রাজ্যের গণভিত্তিতে যে লক্ষণীয় অশুভ পরিবর্তন ঘটেছে তা আর কল্পকথা নয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত জেলাগুলিতে চালানো ২০০৯-এ সমাপ্ত সমীক্ষা ও জনগণনা অনুযায়ী ১৯৯২ সালেই বাংলাদেশী বেআইনী অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ছিল ১.৫ থেকে ২ কোটির কাছাকাছি। এই দুটি সমীক্ষাই জনসমষ্টির এই বিপুল পরিবর্তনে ভয়ঙ্কর আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন। সীমান্ত জেলাগুলিতে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি যে ভবিষ্যৎ বিস্ফোরণের দিকে ঠেলে দেবে তাও সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়।

এরপর ২০০১ ও ২০১১-র সেনসাস রিপোর্ট, প্রথমটি অনুযায়ী ৬টি জেলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়। নির্বাচন কমিশনার হরিশঙ্কর ব্রহ্মাকে উদ্ধৃত করে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সম্প্রতি জানাচ্ছে যে অসমের ১১টি জেলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। এছাড়া ২৭টি জেলার মধ্যে ১৩টি জেলায় ২০০১-২০১১ —এই একদশকে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে তা ভয়ঙ্করভাবে জাতীয় গড়কে ছাপিয়ে গেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তদানীন্তন বৃটিশ কর্তাদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী কোনরকম অনুপ্রবেশ যে ভূমিপুত্র বোড়োদের উপজাতি ও জনজাতিদের স্বাধীনসত্তা ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত হেনে তাদের নিশ্চিহ্ন করতে পারে--- এই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়ে বি টি এ ডি-র গঠন এক ধরনের প্রতারণা। কেননা অবাধে অনুপ্রবেশ চলতে দেওয়া হয়। এর ভয়াবহ পরিণতির শুরু ১৯৫২ সালে। তারপর ১৯৯৪ হয়ে আবার ২০১২। বোড়োদের সঙ্গে মুসলিমদের অবিশ্বাসের বাতাবরণ আজ হানাহানি জায়গায়। এই প্রবণতা ক্রমবর্ধমান কেননা মূল অনুপ্রবেশ সমস্যার গভীরে যাওয়ার কোনও চেষ্টাই হয়নি। ভোটবাক্সটি নিরাপদ রাখা দরকার। যে বিপুল অনুপ্রবেশকারীর ভোটে গগৈ সরকার ক্ষমতায় আসে, আজ বোড়োদের সঙ্গে সংঘর্ষে তারা অনেকেই আর তাদের ভোট কাঙাল কংগ্রেসকে বিশ্বাস করছে না। কেননা তারা আজকের বিপদে নিরাপত্তা পায়নি। তাই দলগত দাঙ্গা বেড়েই চলেছে। বোড়োদের ভূতপূর্ব জঙ্গী গোষ্ঠীগুলির প্রভূত অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চিত হয়েছে। তাই ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

এই টালমাটাল পরিস্থিতির ফয়দা বিজেপি নয়, ফয়দা লুটছে সুগন্ধির কারবারী বদরউদ্দিন আজমলের দল এ আই ডি ইউ ইফ। ২০০৬ সালে বিধানসভায় তাদের সদস্য ছিল ১০। গগৈ-এর অনুপ্রবেশ-অন্ধতায় ২০১১-য় তা ১৮-য় দাঁড়িয়েছে। এখন তারা দাঙ্গা থামাতে ব্যর্থ গগৈ সরকারের বাপান্ত করছে। অন্যদিকে কংগ্রেসী শরিক বি পি পি এফ নিজেদের বঞ্চিত মনে করে কংগ্রেসের সঙ্গে থাকলেও নিজেদের মতো চলছে। এই বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে অনুপ্রবেশের প্রশ্নে বিজেপি বোড়ো নেতাদের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে সঠিক পদক্ষেপই নিয়েছে। তবে দাঙ্গা বিধ্বস্ত বি টি এ ডি অঞ্চলে এখনই তারা প্রভাব না খাটাতে পারলেও ভবিষ্যতে ১২৬ সদস্যের বিধানসভায় ৪০ আসনের সংবেদনশীল এই চার জেলায় রাজনৈতিক টানাপোড়েনের সুযোগ নিতেই পারে।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করে
মাত্র দুই মিনিটে খৈ তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন,
বোলপুর ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

একটি গান জাগিয়ে দিল অন্যভাবে দেবজিৎকে

বেদীর উপর যাঁরা বসেছিলেন তাঁরা গাইছিলেন একটার পর একটা গান। ঠিক সময়ে শুরু হয়েছে। যাঁরা পরে আসছিলেন তাঁরা পিছনের দিকে বসছিলেন। পিছনে বসার সুবিধে দুটো। এক নম্বর, গোটা হলটাকে দেখা যায়। কে কি করছে কার প্রতিক্রিয়া কেমন বুঝতে অসুবিধে হয় না। দু' নম্বর সুবিধে হলো, ভালো না লাগলে সরে পড়া যায় কোনও অজুহাতে দেখিয়ে বা না-দেখিয়েও। আবার যেসব অনুষ্ঠানে যৎকিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা থাকে সেখানে অনুষ্ঠান শেষ না হওয়ার আগে কোনও প্রাপ্তিযোগ থাকে না। সেক্ষেত্রে অনুষ্ঠান একেবারে বিরক্তিকর লাগলেও প্যাকেট-যোগ এড়াতে না চাইলে ব্যাজার মুখে শুনতে হবে। সেদিনের অনুষ্ঠান তেমন ছিল না। প্রথম থেকেই গান মন ছুঁয়ে গেল। সমবেত গান। গাওয়া হচ্ছিল স্পষ্ট উচ্চারণে যথাযথভাবে। মন ভরে গেল দেবজিতের।

তানপুরা এস্রাজ মৃদঙ্গ সহযোগে গান পরিবেশন। সুর ছড়িয়ে পড়ছিল হলের মধ্যে। স্পষ্ট উচ্চারণ প্রত্যেকের। কথা আর সুরে কেমন এক প্রতিক্রিয়া। ঘোর-লাগা অবস্থা নয়, গান যেন জাগিয়ে দিচ্ছিল। নাড়িয়ে দিচ্ছিল। 'যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু মিথ্যাচিন্তা নয়।/যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু মিথ্যাকর্ম নয়।/যদি দণ্ড সহিতে হয় তবু মিথ্যা বাক্য নয়।/জয় জয় সত্যের জয়।' এগিয়ে চলল গান। হলের সব শ্রোতাই নির্বাক, নীরব। কানের ভিতর দিয়ে গানের কথাগুলো যেন হৃদয় ছুঁয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ আবেগে মাথা দোলাচ্ছে।

'যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু অশুভচিন্তা নয়।/যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু অশুভকর্ম নয়।/যদি দণ্ড সহিতে হয় তবু অশুভকর্ম নয়।/জয় জয় মঙ্গলময়।' এতো প্রার্থনার কথা। অঙ্গীকারের বাণী। সংকল্পব্রত উচ্চারণ। সুরের অনুরণন যেন মনের গভীরে ঢেউ তুলছিল। গান চলেছে পুরোদমে। দৃঢ় প্রত্যয়ে প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ। অর্থ বুঝে নিলে তা ভিতর থেকে নাড়িয়ে দেয়। মনে হয়, চারপাশে এত কদর্য আচরণ মানুষের, তারমধ্যে মনে যেন কে আলোর দীপ্তি ছড়িয়ে দিচ্ছিল। বলছিল, 'জেগে ওঠো। বারবার ব্রতবদ্ধ হয়ে উচ্চারণ করো গানের কথাগুলি।'

সুর ছড়িয়ে পড়ছে। তার প্রতিক্রিয়া একেকজনের মনে একেকরকম রূপ নিচ্ছে। গান তো থামছে না। এসে গেলো অন্যকথা। 'যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়।/যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়।/যদি মৃত্যু নিকট হয়, তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়।/জয় জয় ব্রহ্মের জয়।' গান মঞ্চে গাওয়া হচ্ছে। তানপুরা এসরাজ মৃদঙ্গ মিলেমিশে যেন গানকে পৌঁছে দিয়েছে অন্যমাত্রায়।

গানের রেশ ছড়িয়ে পড়ছে বলেই একসময় দেখা গেল হলের কোথাও আর ফাঁকা জায়গা নেই। গান আকুল করেছে মনপ্রাণ— এটা বোঝা যাচ্ছিল। এগিয়ে চলছিল কথা আর সুরে-সমৃদ্ধ রূপ নিয়ে। 'আনন্দ চিত্তমাঝে আনন্দ সর্বকাজে।/আনন্দ সর্বকাজে দুঃখ বিপদজালে।/আনন্দ সর্বলোকে মৃত্যুবিরহ শোকে—/ জয় জয় আনন্দময়।।'

গানটা হচ্ছিল একটু বেশি সময় ধরে। ঘুরে ফিরে আসছিল কথাগুলো। আশা-আনন্দ-সংকল্প জাগরণের তপ্ত প্রত্যয় যেন মিশে রয়েছে তার মধ্যে অচ্ছেদ্যভাবে। বলার কথা বোধহয় একটাই, 'মোরা আনন্দ মাঝে মন আজি করিব বিসর্জন।' একই অঙ্গীকার অন্যভাবে করা হয়েছে আগে, 'মোরা মঙ্গলকাজে প্রাণ আজি করিব সকলে দান।' তাহলে আনন্দ মঙ্গল কাজের কথা বলা হলো। তার আগেও তো উচ্চারিত হয়েছে সংকল্প বাক্য : 'মোরা সত্যের 'পরে মন আজি করিব সমর্পণ।' সেজন্যে তিনটে কাজের কথা স্পষ্ট 'বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য, খুঁজিব সত্যধন।' আর সেইসঙ্গে জয়ধ্বনি দিয়ে বলতে অসুবিধে নেই 'জয় জয় সত্যের জয়।' আর মঙ্গলকাজে সব দান করে প্রাপ্তি কি? 'লভিব পুণ্য, শোভিব পুণ্য, গাহিব পুণ্যগান।' আর তারপর সমবেতভাবে বলতেই হয়, 'জয় জয় মঙ্গলময়।'

সত্য আর মঙ্গলের পর ঈশ্বরের নাম করতেই হয়। কারণ তিনিই সঞ্চালক, নিয়ন্ত্রক। সংকল্প নেওয়া আর তা পালনের পিছনে তাঁরই নিত্য প্রেরণা। গানের কথা ছড়িয়ে পড়ল, 'সেই অভয় ব্রহ্মনাম আজি মোরা সবে লইলাম---/ যিনি সকল ভয়ের ভয়।/' তারপরে বলতে অসুবিধে নেই, 'মোরা করিব না শোক যা হবার হোক চলিব ব্রহ্মধাম।/ জয় জয় ব্রহ্মের জয়।'

চোখের সামনে সব যেন স্পষ্ট হচ্ছে। কেমন এক তৃপ্তি, প্রশান্তি। কেন কিসের জন্যে এভাবে নিজেকে জাগিয়ে তুলবো? বেদি থেকে গাওয়া গানের কথা ছড়িয়ে পড়ছিল, 'মোরা আনন্দ মাঝে মন আজি করিব বিসর্জন।/ জয় জয় আনন্দময়।/ সকল দৃশ্য সকল বিশ্বে আনন্দনিকেতন।/ জয় জয় আনন্দময়।'

সত্য মঙ্গল ব্রহ্ম আনন্দ মিলেমিশে গেছে গানের সুর তাল লয়ে। কথাগুলো যেন জাগিয়ে দিচ্ছিল দেবজিৎকে। গান শেষ হওয়ার পর সে বেরিয়ে এলো প্রার্থনার ঘর থেকে। আজ আর অন্য গান শুনতে চায় না। এই গানটা তাকে মোহিত করেছে। তার সর্বসত্তায় যেন প্রেরণা সঞ্চার করেছে। দেবজিৎ ঠিক করল, বাড়ি ফিরে গানটা শুনবে কয়েকবার। নিজে গাইবার চেষ্টা করবে।

ঐতিহাসিক দুর্গ পণহালগড়

সোমশুভ্র চক্রবর্তী

মহারাষ্ট্রের কোলাপুর শহরের ২০ কিমি উত্তর-পশ্চিমে, দুর্গম সহ্যাদ্রি পর্বতমালার বুকে গজাপুর গিরিসংকটের অদূরে অবস্থিত পণহালা বা পণহালগড় দুর্গ। দুর্গম ভৌগোলিক অবস্থানের ফলে পণহালগড় ছত্রপতি শিবাজী, শম্ভাজীরাজে এবং বীরাঙ্গনা মহারাণী তারাবাঈয়ের শাসনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্ররূপে বিকশিত হয়েছিল।

দাক্ষিণাত্যের অন্যতম বৃহত্তম দুর্গ পণহালগড় ২৭৭২ ফিট উচ্চতায় অবস্থিত। অনেকগুলি ভূগর্ভস্থিত সুড়ঙ্গ, প্রহরাদির জন্য নির্দিষ্ট ১১০টি স্থান, ছিদ্রযুক্ত সুদৃঢ় প্রাচীর এবং রাজদিন্দী প্রভৃতি শক্তিশালী বুরুজগুলি দুর্গটিকে সুরক্ষা প্রদান করত। পণহালগড়ের স্থাপত্য মূলত বিজাপুরী শৈলীর দ্বারা প্রভাবিত হলেও আজও প্রাচীন শীলহারদের শিল্পকীর্তির কিয়দংশ দুর্গে বর্তমান। দুর্গের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান হলো মহারাণী তারাবাঈয়ের মহল যেটি বর্তমান সরকারি বিদ্যালয়, অফিস ও ছাত্রাবাস রূপে ব্যবহৃত হয়। 'আঁধার বাভাদি' বা গুপ্ত কুয়া যা দুর্গে জলের মূল উৎস, কলাবন্তিকা মহল, তিনটি বৃহৎ কুঠিযুক্ত 'অম্বরখানা' বা শস্য ভাণ্ডার (যেটির সাহায্যে শিবাজী সিদ্দি জৌহরের বাহিনী দ্বারা পাঁচ মাস ধরে চলা পণহালগড় অবরোধ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েছিলেন), চতুষ্পার্শ্বের মনোরম দৃশ্য প্রত্যক্ষের জন্য নির্মিত 'সজ্জাকুঠি' এবং অতিরিক্ত শস্যভাণ্ডার 'ধর্মকুঠি' প্রভৃতি দুর্গের গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্যস্থল। দুর্গের মূল কপাট 'তিন দরওয়াজা' ছাড়া বাকি গুরুত্বপূর্ণ দুয়ারগুলি হলো 'ওয়াগ দরওয়াজা' এবং সঙ্কটকালে ব্যবহারের জন্য দিয়ে রাজদিন্দী বুরুজের 'গুপ্তদুয়ার' শিবাজী মহারাজ পবনখিন্দের যুদ্ধের সময় বিশালগড়ে প্রস্থান করেন।

১১৭৮-১২০৯ খৃস্টাব্দের মধ্যে শীলহার বংশীয় রাজা দ্বিতীয় ভোজ দ্বারা নির্মিত হয় পণহালগড়। ক্রমন্বয়ে শীলহার, যাদব, বাহমণি ও আদিলশাহী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয় এই প্রাচীন দুর্গটি। দীর্ঘ ১৭০ বছর যাবৎ আদিলশাহী শাসনের অন্তর্গত থাকা পণহালগড়কে ১৬৫৯ সালে ছত্রপতি শিবাজী তার স্বরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। শিবাজী সৈন্যসহ পণহালগড় অবরোধ করেন এবং তিনদিনের মধ্যেই এটি মারাঠাদের অধিকৃত হয়। ১৬৬০ সালে আদিলশাহী সর্দার সিদ্দি জৌহর ও তার ৩৫ হাজার সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের গতিরোধ করতে শিবাজী ছয় হাজার বীর মারাঠা সৈন্য নিয়ে পণহালগড়ে আশ্রয় নেন। সুদীর্ঘ চারমাস যাবৎ দুর্গের মারাঠা যোদ্ধাগণ বীরবিক্রমে বিপুল আদিলশাহী বাহিনীর অবরোধের প্রতিরোধ করেন। দুর্গে খাদ্য ও জলাভাব দেখা দিলে শিবাজী পণহালগড় ত্যাগ করে, অদূরে বিশালগড় থেকে যুদ্ধ পরিচালনার নির্ণয় নেন। শিবাজীর কৌশল অনুযায়ী তার আত্মসমর্পণের ঘোষণাপত্র পেয়ে আদিলশাহী বাহিনী আনন্দে নজরদারি শিথিল করে দেয়। এই শিথিলতার সুযোগ নিয়ে শিবাজী মাত্র ছয়শত মাওয়ালী সৈন্য নিয়ে গুপ্ত দরজা দিয়ে পণহালগড় ত্যাগ করে প্রচণ্ড দুর্যোগের রাত্রে অতি দুর্গম পথে কুড়ি ক্রোশ দূরে বিশালগড়ের দিকে প্রস্থান করেন। গজাপুরের গিরিসংকটের মুখে বাজীপ্রভু দেশপাণ্ডের নেতৃত্বে মাত্র তিনশ' মারাঠা বীর সমগ্রদিন মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে বিশাল শত্রুবাহিনীর গতিরোধ করেন। অবশেষে অপরাহ্নে শিবাজীর নিরাপদে বিশালগড় পৌঁছানোর ইঙ্গিত পাবার পর রণক্লান্ত রক্তরঞ্জিত মহাশূর বাজীপ্রভু শত্রুসৈন্যের আঘাতে মৃত্যুবরণ করেন। পণহালগড়ের ভূমি ধন্য হয় বীরচূড়ামণি বাজীপ্রভুর দেবোপম শৌর্যে ও অভূতপূর্ব বলিদানে। ১৬৭৩ সালে স্বরাজ্যের বীর সর্দার কোণ্ডাজী ফর্জন্দ এবং গণাজী মাত্র ষাটজন মারাঠা বীর নিয়ে পণহালগড়ের গুপ্তদুয়ার ভেদ করে শত্রুসৈন্য সংহার করতে দুর্গের মূল দুয়ার খুলে দেন এবং তানাজীর নেতৃত্বে বিশাল মারাঠাবাহিনী দুর্গে প্রবেশ করে, শীঘ্রই স্বরাজ্যের গৈরিক ধ্বজা উড্ডীন হয় পণহালগড়ের শীর্ষে। ১৬৮৯ সালে শিবাজীর জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভাজী মুঘলদের হাতে বন্দী হলে পণহালা মুঘলবাহিনীর অধিকৃত হয়। বেশ কিছু সময় ধরে কখনও মুঘলদের, কখনও মারাঠাদের দ্বারা অধিকৃত হয় পণহালগড়। এই সময়েই বিশাল মুঘলবাহিনী পণহালগড় অবরোধ করলে ছত্রপতি রাজারাম ভিখারীর বেশে দুর্গ ত্যাগ করেন। তার পত্নী তারাবাঈ পণহালাতেই রয়ে যান। পণহালগড়েই তারাবাঈ রাজ্য পরিচালনা, কূটনীতি ও রাষ্ট্রনীতির শিক্ষা লাভ করেন, তার প্রজাবৎসলতার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

১৭০০ সালে রাজারামের মৃত্যুর পর তারাবাঈ দক্ষতার সঙ্গে ভঙ্গুরপ্রায় মারাঠা শক্তির মধ্যে নবপ্রাণের সঞ্চার করেন। তারাবাঈ তার পুত্র নাবালক দ্বিতীয় শিবাজীর হয়ে রাজ্যের সমস্ত কার্যভার পণহালগড়কে কেন্দ্র করে সুদক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন। ১৭০৯ সালে তাঁরই তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয় কোলহাপুরে ভোঁসলে বংশের দ্বিতীয় স্বাধীন রাজ্য, পণহালগড় হয় যার রাজধানী। তারাবাঈয়ের অপ্রতীম রণনীতি এবং অভূতপূর্ব রাষ্ট্র পরিচালনার ফলস্বরূপ মারাঠাশক্তি দাক্ষিণাত্যে মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রভূত সাফল্যলাভ করে এবং পুনরায় ছত্রপতি শিবাজীর সময়কার সুবর্ণযুগের প্রত্যাবর্তন হয় মারাঠা সাম্রাজ্যে। ১৭৮২ সালে পণহালগড় থেকে রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত হয় কোলহাপুর শহরে। ১৮২৭ সালে শাহেজীর রাজত্বকালে পণহালগড় বৃটিশদের অর্পণ করা হয়। ১৯৪৭ সাল অবধি দুর্গটি বৃটিশবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ব্যারাকরূপে ব্যবহৃত হোত।

বাজীপ্রভুর নেতৃত্বে মারাঠাবাহিনীর অতুলনীয় শৌর্য ও চরম বলিদানে ধন্য পণহালগড় আজও দেশপ্রেমিক ভারতবাসীর নিকট তীর্থসমান। ▯

ব্রহ্মাণীমাতার পুজো ও মেলা

নবকুমার ভট্টাচার্য

মনসাদেবীর লৌকিক পুজো ও অনুষ্ঠান বেশ প্রাচীন। প্রাচীনকালের স্মৃতি এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। শুধুমাত্র সাপের আক্রোশ থেকে বাঁচতে ভক্তরা মনসা পুজো করেন না, ভক্তের সর্বপ্রকার মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্যই ভক্তরা তাঁর কাছে মানত করে থাকেন। দেবীর সন্তুষ্টির জন্য গোদুগ্ধ অবশ্যই প্রয়োজন। বস্তুত দুধ ছাড়া মনসার পুজো হয় না। মনসামঙ্গল কাব্যে দেখা গেছেন মর্ত্যে মনসাদেবীর পুজোর প্রথম এবং প্রধান উদ্যোক্তা ছিলে গো সম্প্রদায়ের বালকেরা। আবার শঙ্কর গারুড়ির কাছে মনসাকে গোয়ালিনি বেশেই উপস্থিত হতে হয়েছিল।

নদীয়া জেলায় ব্রহ্মাণী মনসারূপে পূজিতা হন। ওই জেলায় ব্রহ্মাণীতলা বলে কয়েকটি স্থানের নামও রয়েছে। বাংলায় মনসা একাধিক নামে পুজো পেয়ে আসছেন। তার মধ্যে বিষহরি, পদ্মা, মনসা প্রমুখ সর্বাধিক প্রচলিত নাম। ব্রহ্মাণী নামটা প্রধানত অপ্রচলিত, বর্তমানে নদীয়াতেই সীমিত। নদীয়া জেলার নবদ্বীপের জাননগরে প্রতিবছর ব্রহ্মাণীর পুজো হয়। ব্রহ্মাণীতলার মেলায় দেহতত্ত্ব গান, অর্থাৎ মেলায় আগেকার দিনে 'প্রেমানন্দে দেহতত্ত্ব গায়, নেড়া নেড়ী' একটি লক্ষ্যণীয় বিষয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থ থেকে জানা যায় নাকাশিপাড়া থানার গাছা গ্রামেও ব্রহ্মাণীমাতার পুজো হয়ে থাকে। নাকাশিপাড়ায়ও একটি ব্রহ্মাণীতলা রয়েছে।

কথিত রয়েছে, নাকাশিপাড়ায় জমিদার সিংহ পরিবারের ডোমনচন্দ্র সিংহ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মা ব্রহ্মাণীর পুজো শুরু করেন। তাঁর জমিদারির মধ্যে এক জঙ্গলে এই পুজোর সূচনা। সিংহদের বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে আদি বাসভূমি ছিল। তাঁদের পূর্বপুরুষ রামরাম সিংহ কৃষ্ণনগরের রাজার দেহরক্ষীর কাজ নিয়ে এদেশে এসে বসবাস করেন। রাজবাড়ির সূত্রেই সিংহ পরিবার নাকাশিপাড়ায় জমিদারি লাভ করেন। রামরাম সিংহ মহাশয়ের তিন পুরুষ পর অর্থাৎ বিনোদবিহারী, নীলকণ্ঠ এবং সুজন সিংহের পর ডোমন সিংহ স্বপ্নাদেশ পান। এ সম্পর্কে যে কিংবদন্তী রয়েছে তা হলো— ডোমন সিংহের সময় একদিন নাকাশিপাড়ার জমিদারবাড়ির কাছারিতে কর্মচারীরা নানা কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। এমন সময় একজন

শাঁখারি এসে বলল তিনি স্বয়ং জমিদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। তার ইচ্ছানুসারে শাঁখারিকে জমিদারের সামনে উপস্থিত করা হলে শাঁখারি বলল, আপনার মেয়ে জঙ্গলের মধ্যে আমার কাছ থেকে শাঁখা নিয়ে হাতে পরেছে। শাঁখা পরার পর দাম চাইলে তিনি জমিদারের কাছ থেকে দাম নিতে বললেন। শাঁখারির কথা শুনে জমিদার বিস্মিত হয়ে বললেন, আমার মেয়ে জঙ্গলের মধ্যে তোমার কাছে শাঁখা পরতে যাবে কেন? যাও এটা তোমার বুজরুকি। শাঁখারি তখন বলল, মেয়েটি বলেছে বাড়ির কাছের দীঘিতে সিঁড়ির ধারে একটা কুলুঙ্গিতে যে পয়সা আছে তা থেকেই শাঁখার দাম শোধ করে দিতে।

শাঁখারির কথা শুনে জমিদার তাঁর কর্মচারীদের নিয়ে দীঘির ঘাটে গেলেন। কুলুঙ্গির খোঁজ চলছে। এমন সময় মাঝ দীঘির মধ্যে শাঁখা পরা দুটি সুন্দর হাত ভেসে উঠল। কুলুঙ্গির মধ্যেও অনেক ধনসম্পদ পাওয়া গেল। দিনেরবেলা এই ঘটনার পর সেই রাতেই ডোমনচন্দ্র স্বপ্ন দেখলেন— একজন সুন্দরী মাতৃরূপা নারী বলছেন 'আমি মা ব্রহ্মাণী তোর গ্রামে এসেছি। পুজো দিস, আমি থাকব। জঙ্গলের মধ্যেই আমাকে রেখে দিস।' দেবীর এই আদেশ পেয়েই ডোমন সিংহের ব্রহ্মাণী পুজোর সূত্রপাত। জঙ্গলের মধ্যে যে অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় সুন্দরী মহিলা শাঁখা পরেছিলেন সেখানেই ঘট স্থাপন করে পুজো আরম্ভ হয়। সেই থেকেই শ্রাবণ সংক্রান্তিতে ব্রহ্মাণী মাতার পুজো হয়ে আসছে। পুজো উপলক্ষ্যে মেলাও বসে।

বর্তমানে একটি প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষের গোড়ায় ঘট স্থাপন করে শ্রাবণ সংক্রান্তির সকালে কনৌজ পুরোহিতের দ্বারা ব্রহ্মাণীর পুজো হয়। পুজোর মন্ত্র সামান্য। পুজোতে পাঁঠা, ভেড়া ইত্যাদি বলি হয়। এখন নানা ধরনের মনসার ঘট ভক্তরা মাথায় করে নিয়ে এসে বৃক্ষের চারপাশে স্থাপন করে পুজো দিয়ে থাকেন। পুজো অনুষ্ঠানের পর ঝাপান গান হয়। সাপুড়েরা এসেও কেউ কেউ মেলায় উপস্থিত হয়। এদিন গ্রামে অরন্ধন পালিত হয়, চিড়ে মুড়কি দই কলা ইত্যাদি খাওয়া হয়।

এখন প্রশ্ন, মনসার ব্রহ্মাণী নাম হলো কবে থেকে? বাংলা সাহিত্যের কবি বংশীবদন তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যে ব্রহ্মাণী নাম ব্যবহার করেছেন। তাতে কিন্তু মনসার বিকল্প নাম ব্রহ্মাণী নয়— 'দেবের প্রধান ব্রহ্মা লিখিয়াছে তাতে। হংসবাহন রথে ব্রহ্মাণী সহিতে।' কেতকা দাসের মনসামঙ্গল ব্রহ্মাণীকে পাওয়া যায় মৃত স্বামীকে নিয়ে নদীতে ভাসমানরত বিপদাপন্না বেহুলাকে বর প্রদানকারী হিসেবে— 'বেহুলা বিনয় করে মনসার তরে। মান্দাস লাগিল যোড় ব্রহ্মাণীর বরে।' এ দেবী মনসা নয়। ১৮ শ শতাব্দীর কবি দ্বিজরসিকের মনসামঙ্গলে ব্রহ্মাণী নেই। আছেন ব্রাহ্মণী। 'প্রাণহীন পতিকোলে ভাসে একাকিনী। হেনকালে দেখা দিল জগতী ব্রাহ্মণী'। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়' গ্রন্থে অবশ্য এই ব্রাহ্মণীকেই বিষহরি বলেছেন। সম্ভবত কেতকা দাসের মনসামঙ্গল গানের প্রভাবে ব্রহ্মাণী সর্পের দেবী মনসার অন্য নাম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। ▯

বাসস্টপের ছাতিম গাছ আর কয়েকটা দিন

লোকটা বাসস্টপে দাঁড়িয়ে দুটো কাজ করছিল। হাতের নাগালে থাকা ছাতিমগাছের ডাল থেকে পাতা ছিঁড়ছিল। আর কিছুক্ষণ অন্তর থুতু ফেলছিল। স্কুলে যাওয়ার সময় বাস থেকে নেমে সেটা লক্ষ্য করছিল অভীক। একটু দেখে সরাসরি বলেছিল, 'ওরকম কাণ্ড করছেন কেন?' লোকটা একটু থতমত খেয়ে জবাব দেয়, 'কি করছি?' অভীক বলেছিল, 'থুতু ফেলছেন আর গাছের পাতা ছিঁড়ছেন।' লোকটা ঠোঁট উল্টে বলল, 'এই জায়গাটা আর গাছটা কি তোমার বাড়ির?' অভীক বলেছিল, 'আমার নয়, তবে আমাদের শহরের'। লোকটা বলে উঠল, 'তোমার অত মাতব্বরির দরকার নেই। পড়তে যাচ্ছ যাও, কোথায় কি হচ্ছে দেখার দরকার নেই।' লোকটা আরও কি বলতে যাচ্ছিল, আরেকটা লোক বলল তাকে নিচু স্বরে, 'আমাদের এসব ঝুট ঝামেলায় যাওয়ার দরকার নেই। ছেলেটাকে চিনে রাখ। পরে ব্যবস্থা হবে।' অভীক এবার বলল, 'তোমাকে সাহায্য করার লোকও আছে দেখছি। ঠিক আছে। এরপর ওইরকম অন্যদিন করতে দেখলে ব্যাপারটা খারাপ হবে।' লোকটা বলল, 'যা তো ছোকরা, মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবো।' অভীক বলল, 'কি মুণ্ডু ঘোরাবে?' সে পিঠ থেকে ব্যাগটা খুলে দিলো সমিতকে। লোকটার সামনে গিয়ে বলল, 'ঘোরাও মুণ্ডু, কেমন হিম্মত!' লোকটা বুঝল, অবস্থা সুবিধের নয়। সে আর তার সঙ্গীটা একটা গাড়িতে উঠে পড়ল। সাদা রঙের দামি গাড়ি। লোকটা বলল গাড়ি থেকে, 'তোর দিন ফুরিয়ে এসেছে ছোকরা।' অভীক বলল, 'তোমাকে নাগালে পেলে দেখবো আবার।'

বাসস্টপের পানওলাটা সব খবর রাখে। সে বলল, 'খোকাবাবু, লোকগুলো ভালো নয়।' অভীক বলল, 'যা খুশি করবে নাকি! কি ভেবেছে!' অভীক ক্লাস টেনে পড়ে। তার সাহস যথেষ্ট। সুন্দর সুগঠিত চেহারা। পড়াশুনাতেও ভালো। বাসস্টপের একটু দূরে বসাক ভ্যারাইটি স্টোর। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। সেই দোকানের সুজিতকাকু বলল, 'তুমি সাহস করে বলেছো।' ভালই করেছো। ওরা খারাপ লোক তো। সাপের থেকেও ভয়ঙ্কর। ওদের লেজে পা পড়লে শয়তানের চেহারা নেবে। তোমাকে সাবধানে থাকা দরকার।'

স্কুলে কেউ কিছু বলল না। কারণ স্কুলে আসার পথের ঘটনা। স্কুলের মধ্যে নয়। আর যে কারণে ওইরকম কথাকাটাকাটি হয়েছে তার পিছনে ভালো উদ্দেশ্য আছে— এটা হেডস্যার বুঝেছেন। অভীককে ডেকে বললেন, 'তুমি একটু সাবধানে থাকবে। খারাপ লোকদের এড়ানোই ভালো।' অভীকের সহপাঠী বিতান বলল, 'ওদের সহজে রেহাই দেবো না যদি তোর ওপর হামলা চালায়।' বিতান ক্যারাটেতে ওস্তাদ। সাইকেলে যাতায়াত করে। বিতানের আরও সঙ্গী আছে।

পরের দিন সেই লোকটাকে দেখল অভীক। একই ভঙ্গিতে পাতা ছিঁড়ছে। থুতু ফেলছে। অভীক দেখল একটু দূরে লোকটার সাকরেদ রয়েছে। মোবাইলে কথা বলছিল লোকটা। বিতানের সাইকেলটা সুজিতকাকুর দোকানে রয়েছে। বিতান নেই। গাছের নিচে আমদানি হয়েছে এক ভবঘুরে। একমুখ চুল-দাড়ি। ময়লা পোশাক। ইঁটের টুকরো দিয়ে ছবি এঁকেছে। ভগবানের ছবি। ভবঘুরেটা মনে হয় কথা বলতে পারে না। একমনে নিজের আঁকা ছবি দেখিয়ে কিছু খাবার কেনার পয়সা চাইছে। অভীক বাস থেকে নেমে কড়া চোখে দেখল। লোকটা বলল, 'কিরে খোকা মোড়ল? আজ কিছু বলবি নাকি? আজও পাতা ছিঁড়েছি, থুতু ফেলেছি।' অভীক বলল, 'তোমাকে এবার অন্যভাবে শিক্ষা দিতে হবে দেখছি।' লোকটা হেসে উঠল। আর পিছন থেকে তার স্যাকরেদ এসে অভীককে জাপটে ধরল। সেই দামি সাদা গাড়িটা এসে দাঁড়াল। অভীককে তোলার চেষ্টা করল দুজনে।

এবার অন্য দৃশ্য। লোকদুটোর একটাকে তুলে ভবঘুরে অন্যটার ঘাড়ে ছুঁড়ে মারল। দুজনের বোধহয় হাড়গোড় ভেঙে গেল। সাদা গাড়িটা পালাবার জন্য তৈরি। রাধাপুকুর থানার বড়বাবু সুদর্শন চাকী নির্ভুল লক্ষ্যে চাকায় গুলি করলেন। গাড়িটা একটা গাছে ধাক্কা খেয়ে থামল। ড্রাইভারটা

পালাচ্ছিল। ধরে ফেলল দৌড়ে গিয়ে ছেলের দল। চোরাচালানদার দল। ভবঘুরে আরও দুটো লোককে ধরলো। ভীড়ে মিশে ছিল তারা। ভবঘুরের ঘুঁষিতে তারাও কাত। কিছুক্ষণের মধ্যে এসে গেলেন পুলিশের উপর মহলের লোকজন। পুলিশকর্তাকে একটা সিডি দিল ভবঘুরে। ভগুরাম জৈনের অপকর্মের হদিশ তার মধ্যে ধরা আছে। পুলিশ লোকটাকে ধরতে পারছিল না কয়েকটা কারণে। এবার আর ধামাচাপা দেওয়ার উপায় রইল না।

অভীকের পিঠ চাপড়ে বলল ভবঘুরে, 'যাক, এই অপারেশনে আমরা সফল কি বলিস!'

'বিতান!' জানা গেল সুজিতকাকুর দোকানে রাতে ছিল। মেকআপ নিয়ে ভোর থেকে বাসস্টপে বসেছিল। পরেরদিন কাগজে কাগজে ছবি বেরোল বিতান অভীকদের।

সেদিন স্কুলে আসার সময় বাসস্টপের গাছটাকে দেখল। সে যেন স্বস্তিতে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে অভীকদের।

কৌশিক গুহ

বই কথা কই

সবসময়ই বই নিয়ে মাতামাতির সময়

'কি কি বই পড়লে তা মনে রাখতে না পারলে মুশকিল। একটা ছোট ডায়েরি রাখবে, তাতে পড়া বইটার নাম লিখবে। কি বিষয়ের বই। কোন সময়ে প্রকাশিত। কত দাম। প্রকাশকের নাম লিখে রাখতে পারো। তাতে বছর শেষে দেখবে অনেক বই তোমার পড়া হয়ে গেছে। পড়ার মজাটা সেখানেই। ভুলে গেলে তো চলবে না, আনন্দে পড়বে। জানার জন্যে পড়বে। তোমার পড়া শুধু তোমার নয়, অন্যদেরও কাজে লাগবে। ছোটোদের বলতে পারবে অনেক কিছু। বড়োদেরও। চারপাশে কত বই। তার মধ্যে থেকে অফুরন্ত মজা খুঁজে পাবে তুমি। মনে রাখতে হবে, পড়ার মতো জিনিস নেই। বইয়ের মতো বন্ধু নেই। বই তোমাকে শুধু দেবে, চাইবে একটু যত্ন আর ভালোবাসা। তোমাকে এগিয়ে দেবে।' কথাগুলো বললেন অমিতাভ-স্যার। তিনি আরও বললেন, 'তুমি কিছু বই অন্যদের দেবে। যেগুলো তুমি ব্যবহার করছো না। যারা বই কিনে পড়তে পারে না তারাও তোমার বন্ধু। তাদের একটু সাহায্য করলে দেখবে মন আনন্দে ভরে গেছে। বই নিয়ে মাতামাতি হইচই করার সময় কেউ যেন পড়ে না বাদ বা বাকি— এটাই বলতে চাই বার বার।'

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. কোন্ ছোটোদের পত্রিকা সবথেকে বেশিদিন প্রকাশিত হচ্ছে? কতবছর? কোথা থেকে বের হয়? কতদিন অন্তর? কোন্ ভাষায়?

২. রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ও প্রেরণায় কোন্ বিখ্যাত ছোটোদের লেখক লেখা শুরু করেছিলেন?

৩. রবীন্দ্রনাথের 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পটির দুটি প্রধান চরিত্রের নাম?

৪. রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্পটির চলচ্চিত্ররূপ কে দেন? মূল চরিত্রের নাম?

৫. বিশ্বভারতীর আশ্রমগীতি কি? কার লেখা ও সুর?

উত্তর : ১. মৌচাক। ৯৩ বছর। কলকাতা। প্রতিমাসে। বাংলা। ২. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩. সুবলচন্দ্র। সুশীলচন্দ্র। ৪. তপন সিংহ। তারাপদ। ৫. 'আমাদের শান্তিনিকেতন, আমাদের সব হতে আপন'। রবীন্দ্রনাথের।

ছোটোদের বলছি

উলটো পালটা

মাতব্বর মানুষ সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়তি কথা বলা বরাবরের অভ্যেস। সব জায়গায় নিজের প্রভাব দেখাতে চায়। সব বিষয়ে কথা বলা চাই। ভাইপো পল্লব শ্যামবাজারে কমপিউটারের একটা জিনিস কিনতে যাচ্ছিল কুমারদের দোকানে। সুশান্ত বলল, 'আমার নাম করে বলিস।' পল্লব বলল সোজাসুজি, 'পয়সা দিয়ে জিনিস কিনবো। খামোকা তোমার নাম বলতে যাবো কেন? আমাকে যখন কোনও সুবিধে দেবে না তোমার নাম বললে।' সুশান্ত চুপ করে রইল।

।। ২।।

মোহন সিংহের বাবা অজিতবাবুর সঙ্গে পাড়ার মিষ্টির দোকানের সুসম্পর্ক অনেকদিনের। কয়েক বছর ধরে তাঁর মিষ্টি খাওয়া বারণ। অনেকেই দেখেছে তিনি টপাটপ মিষ্টি খেয়ে পয়সা দিয়ে চলে যান। মোহনের এক বন্ধু সৌরভ একদিন দেখতে পেয়ে বলল, 'মেসোমশাই আপনি?' তিনি কিছুটা ধরা পড়া অপরাধীর মতো বললেন, 'তুমি মিষ্টি খেতে চাইলে খেতে পারো। বাড়িতে আবার বলতে যেও না।'

।। ৩।।

সবকিছু বাড়িয়ে বলা অভ্যেস কল্যাণ বণিকের। লোকে বলে, 'ওঁর কথা শুনতে খারাপ লাগে না। তবে বিশ্বাস করার জন্যে তর্ক বাদ দিতে হবে। কথাই তো আছে, 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু। তর্কে বহুদূর।' সেদিন কল্যাণ বললেন, 'আমাদের ছেলেবেলায় বৃষ্টির ফোঁটাগুলো হোত পুকুরের মতো।' সবাই বলে 'তাইতো!'

রামগরুড় সংকলিত

স্বাধীনতা আন্দোলনে কল্পনা দত্ত যোশী

মিতা রায়

স্বাধীনতা দিবস পার হয়ে গেল। এই দিনটি উদযাপন করা হয়েছে মহাসমারোহে। উঠে এসেছে নানা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা। কিন্তু প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত থেকে জীবনকে তুচ্ছ করে যাঁরা বিপ্লব করেছেন, বিশেষত মহিলারা— তাঁদের কথা ক'জন মনে রাখেন বা স্মরণ করেন! এই বছরে স্বাধীনতা দিবসে এমনই এক নারী বিপ্লবী উপেক্ষিতই থেকে গেলেন যাঁর এই বছরে শতবর্ষের সূচনা হচ্ছে। তিনি হলেন কল্পনা দত্ত যোশী।

পরাধীনতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিভক্ত বাংলায় মূল ঘাঁটি ছিল চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামেই ঘটেছিল বিপ্লবীদের উত্থান। কল্পনা দত্ত ছিলেন চট্টগ্রামের বাসিন্দা। ১৯১৩'র ২৭ জুলাই চট্টগ্রামের শ্রীপুর গ্রামে রায়বাহাদুর পরিবারে জন্ম হয় তাঁর। দাদামশায় দুর্গাদাস দত্তগুপ্ত ছিলেন রায়বাহাদুর। বাবা ছিলেন সরকারি কর্মচারী। বাড়িতে কোনও বিপ্লবের আবহাওয়া ছিল না, কারণ ইংরেজ সরকারের অধীনস্থ ছিলেন তাঁরা। মেধাবী কল্পনা পড়াশোনায় ভাল ছিলেন। অঙ্ক ও সংস্কৃতে লেটার পেয়ে সাফল্যের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় বেথুন কলেজে আই এস সি পড়তে ভর্তি হন। সেইসময় চলছিল চারদিকে বিপ্লবাত্মক কাজকর্মের জনজোয়ার। সেই জোয়ারের ঢেউ ছাত্রী কল্পনাকে আন্দোলিত করেছিল। ঠিক এই সময়েই শুরু হয় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের আন্দোলন। সময়টা ছিল ১৯৩০। সে বছরের কলেজের ছুটিতে কল্পনা বাড়ি অর্থাৎ চট্টগ্রামে ফিরে গিয়ে বিপ্লবাত্মক কাজে যোগদানের জন্য এই আন্দোলনের পুরোধা মাস্টারদা সূর্য সেনের সঙ্গে দেখা করেন এবং নিজের ইচ্ছের কথা প্রকাশ করেন। মাস্টারদা বিপ্লবের কাজে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ পছন্দ করতেন না, কিন্তু সাহসী কল্পনার অসীম মনোবল দেখে তাঁকে উৎসাহিত করেন। তাঁর ওপর বিশাল দায়িত্ব চাপিয়ে দেন। সেটি ছিল— ১৯৩১-এ ডিনামাইট ফাটিয়ে জেল থেকে অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীদের বার করে আনা। এই ষড়যন্ত্রে কল্পনা দত্ত লিপ্ত এ ভাবনা ইংরেজ পুলিশের ছিল না, কারণ সে ছিল রায়বাহাদুর বাড়ির মেয়ে। কিন্তু যখন তা স্পষ্ট হয়, তখন পুলিশ তাকে গৃহবন্দী করে। এই অবস্থায় কল্পনা পুরুষের পোশাকে ঘোরাফেরা করলেও পুলিশের জালে ধরা পড়েন।

কল্পনা দত্ত পাহাড়তলির ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের কাজেও ছিলেন সক্রিয়, যার নেতৃত্বে ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার। এই আক্রমণ সফল হয়েছিল ঠিকই; কিন্তু প্রীতিলতা নির্জন মাঠে আত্মবিসর্জন করেন আর কল্পনা দত্ত আত্মগোপন করেছিলেন। ১৯৩৩-এ আরেকটি বিপ্লবাত্মক কাজে মাস্টারদা ও বিপ্লবী তারকেশ্বর ঘোষদস্তিদারের সঙ্গে যোগ দেন। সেটি হলো, সমুদ্রতীরবর্তী গৈরলা গ্রামে ফৌজের সঙ্গে সংঘর্ষ। ঘটনাক্রমে সেই কাজে মাস্টারদা ও তারকেশ্বর পুলিশের জালে ধরা পড়ে গেলেও কল্পনাকে পুলিশ ধরতে পারেনি। বেশিদিন পালিয়ে থাকতে পারেননি; তিনমাস বাদেই ধরা পড়ে যান তিনি। তিনজনের বিচার হয় একইসঙ্গে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার সেকেন্ড সাপ্লিমেন্টারি মামলায় সূর্য সেন ও তারকেশ্বরের ফাঁসির আদেশ হয়। কল্পনা দত্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পরে তা শিথিল করে শুধুই তাঁর কারাদণ্ড হয়েছিল। বেশ কয়েক বছর কারাবাসের পর মহাত্মা গান্ধীর মধ্যস্থতায় কল্পনা দত্ত অন্যান্য বন্দিদের সঙ্গে ছাড়া পান।

দেশ স্বাধীন তখনও হয়নি। কারাগার থেকে বাইরে এসে আবার অসমাপ্ত পড়াশোনা সম্পূর্ণ করার ইচ্ছায় কলকাতায় চলে এসে বেথুন কলেজে ভর্তি হন এবং অঙ্কে অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট হন। ইতিমধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলন হয়েছে। বোম্বাই চলে যান চাকরিসূত্রে। সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পূরণচাঁদ যোশীর সঙ্গে পরিচিত হন। ১৯৪৩-এ বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। দেশের কাজ করাই ছিল যাঁর নেশা, তিনি কখনই থেমে থাকেননি। তাই বিয়ের পর দীর্ঘদিন চট্টগ্রামে পার্টির কাজ করেছেন। ১৯৫০-এ কলকাতায় ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে চাকরি করেন। এরপর দিল্লী চলে যান। সেখানে নারী আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে সৌহার্দ্য সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রেও তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। দীর্ঘদিনের সংগ্রামী জীবনের অভিজ্ঞতা লিখে গেছেন।

এই নির্ভীক সাহসী বিপ্লবী মহিলার কথা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে অবশ্যই প্রেরণাদায়ক। আজকের দিনে তাঁকে তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক। □

ভাবনা চিন্তায় ১৯৪৭ থেকে ২০১২

শংকর পাল

১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট ইংরেজদের হাত থেকে ভারতবর্ষ মুক্ত হওয়ার পর প্রতি বছর ঘটা করে ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। প্রথম প্রশ্ন হলো, ১৫ আগস্টের আগে কি ভারতবর্ষ স্বাধীন ছিল না? রাজনৈতিক স্বাধীনতা হয়তো ছিল না, কিন্তু জাতি হিসেবে ভারতীয়দের— হিন্দুদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল। যদিও ইংরেজদের ইংরেজীয়ানায় অভ্যস্ত ইংরেজী শিক্ষিত তৎকালীন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ দেশবাসীকে ভুল বুঝিয়েছেন— We are a nation in the making (জাতি হিসাবে আমরা গড়ে উঠছি) composite culture, (আমাদের সংস্কৃতি মিশ্র সংস্কৃতি) ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে ভারতরাষ্ট্রের প্রাচীনতা বিষয়ে অনেক প্রামাণ্য উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্যে রামায়ণ-এর উদাহরণ সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত--- লঙ্কাজয়ের পর মর্যাদাপুরুষোত্তম রামচন্দ্র বলেছেন— 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় দেশবাসীকে বোঝানো হোত আমাদের হাতে দেশের শাসনক্ষমতা এলে বা ইংরেজরা ভারত ছেড়ে চলে গেলেই দেশের উন্নতি হবে। উন্নয়নের চাকাটা গড়গড়িয়ে চলবে। অথচ ৬৫ বছর পরে কি দেখছি আমরা? সীমাহীন বল্গাহীন দুর্নীতি সর্বব্যাপী, স্বজনপোষণ, দলতন্ত্রের নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ সমাজজীবনের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত। যারাই দলতন্ত্রের বিরুদ্ধে, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলছে, আন্দোলন করছে বা করবার পরিকল্পনা নিচ্ছে তাদেরকে রাষ্ট্রক্ষমতা বা শাসনক্ষমতা ব্যবহার করে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দ্রব্যমূল্য। কমছে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা। ক্ষমতায় আসীন রাজনৈতিক দল ও নেতা নিজেদের নেতা ও নেতাদের পুত্র-কলত্রদের নিরাপত্তা নিয়ে যতটা চিন্তিত, যত নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন হচ্ছে তার সামান্যতম সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে হচ্ছে না। রেল বা সড়কপথ— কোনওটাই সুরক্ষিত নয়। স্থিতিশীল নয় দ্রব্যমূল্য। ক্রমশই ঊর্ধ্বগামী। বিধায়ক-সাংসদদের ভাতা ও সুযোগসুবিধা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

মাথাপিছু গড় আয় এক এক প্রদেশে এক একরকম। উন্নয়নেও রয়েছে আঞ্চলিক বৈষম্য। এক অঞ্চলে উন্নয়ন হচ্ছে তো অন্য অঞ্চলে হচ্ছে না। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা ৯১,৩৪৭,৭৩৬ আর পাঞ্জাবে ২৭,৭০৪,২৩৬ জন। অর্থাৎ পাঞ্জাবে দু'কোটি আর পশ্চিমবঙ্গে নয় কোটিরও বেশি। অথচ সামরিক বাহিনীতে পাঞ্জাব থেকে রিক্রুট হয় ১৭ থেকে কুড়ি শতাংশ আর পশ্চিমবঙ্গ থেকে এক শতাংশেরও কম। মাথাপিছু বার্ষিক আয়েও গোয়া, দিল্লী অন্য সকল রাজ্যের অনেক উপরে। (সারণী দ্রষ্টব্য) ভারতের ৮টি প্রদেশ আর্থিক দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ--- বিহার, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ। এই রাজ্যগুলিতেই ভারতের প্রায় অর্ধেকের বেশি মানুষ বসবাস করে। যতদিন যাচ্ছে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিপিএল (দারিদ্র্য-রেখার নীচে) তালিকাভুক্ত মানুষের সংখ্যা। কেবলমাত্র মহারাষ্ট্রেই প্রায় দেড়কোটি মানুষ দারিদ্র্য-রেখার নীচে বসবাস করেন। এটাও ৬/৭ বছরের পুরাতন হিসাব। অথচ পৃথিবীতে প্রথম একশ' জন ধনী ব্যক্তির তালিকায় ভারতের দশজনের নাম রয়েছে। তেমনই ফোবর্স ম্যাগাজিনের দুর্নীতির ক্রমতালিকায় ভারতবর্ষের স্থান তর তর করে উপরে উঠে চলেছে। দিল্লী, কলকাতা, মুম্বাই-এর মতো বড় বড় শহরে অপরাধমূলক ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে। বাড়ছে মেয়েদের বিরুদ্ধে অপরাধের ঘটনাও। ▯

সারণী—১

একনজরে বার্ষিক মাথাপিছু আয়

২০১১-১২ (টাকায়)

অন্ধ্রপ্রদেশ	—	৭১৫৪০/-
অরুণাচল	—	৬২২১৩/-
অসম	—	৩৩৬৩৩/-
বিহার	—	২৪৬৮১/-
ঝাড়খণ্ড	—	৩১,৯৮২/-
গোয়া	—	১,৯২,৬৫২/-
গুজরাট	—	পাওয়া যায়নি
হরিয়ানা	—	১,০৯,২২৭/-
হিমাচল প্রদেশ—		৭৩৬০৮/-
জম্মু ও কাশ্মীর—		৪১,৮৩৩/-
কর্ণাটক	—	৬৯,৪৯৩/-
কেরল	—	৮৩,৭২৫/-
মধ্যপ্রদেশ	—	পাওয়া যায়নি
ছত্তিশগড়	—	৪৬,৫৭৩/-
মহারাষ্ট্র	—	পাওয়া যায়নি
মণিপুর	—	৩২,২৮৪/-
মেঘালয়	—	৫৬,১১৬/-
মিজোরাম	—	পাওয়া যায়নি
নাগাল্যান্ড	—	৫৬,১১৬/-
ওড়িশা	—	৪৬,১৫০/-
পাঞ্জাব	—	৭৮,১৭৮/-
রাজস্থান	—	পাওয়া যায়নি
সিকিম	—	পাওয়া যায়নি
তামিলনাড়ু	—	৮৪০৫৮/-
ত্রিপুরা	—	৫০৭৫০/-
উত্তরপ্রদেশ	—	২৯৪১৭/-
উত্তরাখণ্ড	—	৭৫৬০৪/-
পশ্চিমবঙ্গ	—	৫৫৮৪৬/-
আন্দামান ও নিকোবর		৮২,২৭২/-
চণ্ডীগড়	—	পাওয়া যায়নি
দিল্লী	—	১,৭৫,৮১২/-
পণ্ডিচেরী	—	৯৫,৭৫৯/-

('উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর সৌজন্যে)

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে পর্যালোচনা প্রয়োজন

অতিথি কলম

এস কে চ্যাটার্জী

আমাদের দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত নানা ত্রুটি দূর করার সময় এসেছে। যেহেতু কিছু মেঘ কেটেছে এবং জেনারেল বিক্রম সিং চিফ আর্মি স্টাফ-এর দায়িত্বভার নিয়েছেন, আমরা আমাদের সামনে নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে পারি। কিছু সমস্যা স্থলবাহিনীকে নিয়ে আর বাকি সমস্ত বাহিনী ও শীর্ষ নিরাপত্তা বিভাগকে নিয়ে।

শুরুতে যে কথাটা বলার দরকার তা হলো সেনা বিভাগের পরিবর্তন প্রক্রিয়াটাকে জোরে ধাক্কা দিতে হবে। সেনাবাহিনী ছাড়াও প্রতিরক্ষা বিভাগেও পরিবর্তন আনতে হবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক যদি একবিংশ শতকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চায় তাহলে তাকে যথেষ্ট দক্ষ ব্যক্তি নিয়োগ করতে হবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সঙ্গে অন্যান্য সার্ভিস-এর সদর দপ্তরের সঙ্গে সংহতি স্থাপনের সুপারিশ করেছে একাধিক কমিটি। সেই সুপারিশগুলি কার্যকর করতে হবে অবিলম্বে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সর্বোচ্চ স্থানে সার্ভিস অফিসারদের নিয়োগ করতে হবে, যাতে কিনা এঁদের পেশাদারি উপদেশ মন্ত্রীর কাছে পৌঁছায়। সার্ভিস অফিসারদের বিভিন্ন প্রজেক্ট রূপায়িত করার এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আনার দায়িত্ব দিতে হবে, যাতে কিনা ঠিক সময়ে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়।

চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ সিস্টেম এবং জয়েন্ট সার্ভিসেস কম্যান্ড -এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা এখনও প্রচুর পিছিয়ে। একমাত্র আন্দামান ও নিকোবর কম্যান্ড এবং স্ট্র্যাটেজিক কম্যান্ড ছাড়া আমরা অন্য এলাকায় ভৌগোলিক কম্যান্ডকে জয়েন্ট সার্ভিসেস ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হইনি। অবশ্য এই পরিবর্তন উঁচু তলা থেকে আনতে হবে, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ সিস্টেমকে অগ্রাধিকার দিয়ে। থিয়েটার কম্যান্ড-এর কাজ পরে। প্রশ্ন উঠবে, আমাদের সীমিত ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে থিয়েটার কম্যান্ড প্রয়োজন কিনা। কিন্তু তাহলেও এটি শক্তিমান আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের জন্য অপরিহার্য। তাছাড়া তিনটি সার্ভিসেস-এর যৌথ মহড়া যখন বাস্তব রূপ পেয়ে গেছে, তখন জয়েন্ট থিয়েটার কম্যান্ডটি গ্রহণ করা কি জরুরি নয়? যখন তিনটি সার্ভিসেস একসঙ্গে কাজ করার কথা সবাই বলছেন, তখন এদের বিচ্ছিন্ন করে কাজ করলে অভীষ্ট সাফল্যের লক্ষ্যে পৌঁছনো অসম্ভব। চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ সিস্টেম-এর বিরোধিতার ধারণা নিহিত রয়েছে সার্ভিসেসগুলির মধ্যেই। এই বিরোধিতা অবশ্য অন্য দেশেও আছে। যাই হোক, আমাদের সরকারকে দ্রুত পরিবর্তন আনার জন্য খুব তৎপর হতে হবে।

আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে চীন ও পাকিস্তানের দ্বিমুখী আলেখ্যে দেখতে হবে আর দেখতে হবে সন্ত্রাসবাদীদের দমন করার উদ্দেশ্য নিয়ে। আমাদের প্রতিবেশীদের মনে আমাদের সামরিক শক্তি সম্বন্ধে আস্থা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা বেড়ে চলেছে।

ডিফেন্স প্রোকিওরমেন্ট পদ্ধতিকে আরও স্বচ্ছ ও সরল হওয়ার দরকার। আজকাল আন্তর্জাতিক মানের বন্দুক নির্মাণের বিখ্যাত কারখানাগুলিকে প্রকাশ্যে কারণ না জানিয়ে ব্ল্যাক লিস্টেড করা হয়েছে। স্পষ্টতই এধরনের অচলাবস্থা চলতে পারে না। ডিফেন্স সংক্রান্ত নীতি স্বচ্ছ রাখার প্রশ্ন যখন তর্কাতীত, তখন বাধানিষেধ আরোপ বজায় রাখলে আধুনিকীকরণের ব্যাপারটি পিছিয়ে যাবে না কি? নির্বাচন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়সীমা ছেঁটে ফেলতে হবে। একই মাপকাঠি সব রকমের সরঞ্জামের জন্য নয়। অন্য সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে সরঞ্জামের চুলচেরা পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কাছে লেখা জেনারেল ভি কে সিং-এর যে চিঠি ফাঁস হয়েছে, তাতে প্রকাশ পেয়েছে সাজ সরঞ্জামের স্বল্পতা, বায়ুসেনার কম্ব্যাট স্কোয়াড্রোনের হ্রাস এবং নৌবাহিনীর সংগ্রহ নীতির বিলম্ব হওয়া।

ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন সার্ভিসেসকে আরও সৃজনশীল হওয়ার লক্ষ্যে গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে। গ্রহণ করতে হবে আজকের দিনের আক্রমণাত্মক নীতি। ডিফেন্স পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিংগুলিকেও বিশ্বমানের সামগ্রী প্রস্তুত করতে হবে। এই সংস্থাগুলি অনেক দিন ধরে কাজ করে চলেছে, কিন্তু এদের কাজের সুফল এখনও দেখা যায়নি। আমাদের দেশের সমষ্টিগত জীবনে দায়বদ্ধতার খুব অভাব। যাই হোক, দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত এই সব সংস্থাগুলির পক্ষে এমনটি হতে দেওয়া যায় না। ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট

অর্গানাইজেশন সার্ভিসেসকে যথেষ্ট পরিমাণ সতেজ হতে হবে। তাছাড়া কর্পোরেট সেক্টর থেকে কুশলী কর্মী আনতে হবে আর দিতে হবে স্বশাসন।

মুশকিল আসানের জন্য প্রাইভেট সেক্টরকে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরি করতে দেওয়া উচিত। এ ব্যাপারে সরকারের অবশ্যই নির্দিষ্ট কিছু সংস্থাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাইভেট সংস্থা ও ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন সার্ভিসেসগুলিকে তাদের যাবতীয় প্রোডাক্ট বিদেশে বিক্রি করার ছাড়পত্র দিতে হবে। এর ফলে রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্টের উদ্যম সফল হবে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের পরিকাঠামো আমাদের কাছে উদ্বেগজনক। চীন তিব্বতে এমন উন্নত মানের রেল ও সড়কের জাল তৈরি করেছে যে আমরা তার সঙ্গে পেরে উঠব না। আমাদের বেশিরভাগ পরিকাঠামো-ভিত্তিক প্রজেক্ট পিছিয়ে আছে এবং সেগুলি যথেষ্ট গতিশীল করা আমাদের সাধ্যাতীত। এখন সময় এসেছে উত্তর-পূর্ব ভারতের দিকে নজর দেওয়ার, যাতে কিনা আর্থিক লাভ ওরা পায়, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিরাপত্তাও জোরদার হয়।

দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত একটা প্রবাদ আছে— অফিসার ভালো হলে সেনাবাহিনীও ভালো হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের তিনটি বাহিনীর শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে, ব্যবহার করতে হবে তাদের প্রযুক্তি। মুশকিল হলো, আমাদের তিনটি বাহিনীতে জুনিয়র লেভেলের অফিসারদের সংখ্যা খুব কম। আমাদের বাস্তবের সম্মুখীন হতে হবে। মনে রাখতে হবে, যে সেনাবাহিনী আজ আগের মতো কিছু উঁচুতলার অফিসারদের ভাগ্য তৈরির জায়গা নয়। সেই দিন শেষ হয়ে গেছে। সেনাবাহিনীতে সৈনিকদের জীবন বড় কষ্টের। বিশেষত যেখানে তাদের বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুঝতে হয়। তরুণদের সেনাবাহিনীতে আকর্ষণ করার একমাত্র উপায় হলো বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে অন্যান্য সুবিধা দান। তাছাড়া, চুক্তি অনুযায়ী চাকরি জীবন শেষ হলে ওদের চাকরি থেকে বিদায় নেবার সুযোগ দিতে হবে। আজকের দুনিয়ায় তরুণেরা এমন বৃত্তি বেছে নিতে চায় না বা এমন সংস্থায় যোগ দিতে অনিচ্ছুক, যেখানে তাদের সারা জীবন কেটে যাবে। কোনও প্রতিভাকে তার কন্ট্রাক্ট পিরিয়ডের পরেও ধরে রাখতে হলে বোনাসেরও ব্যবস্থা করতে হবে।

সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি বাড়ানো দরকার। এর জন্য পাবলিক ইনফরমেশন ডাইরেক্টরেটকে তেজি হবার জন্য আরও ক্ষমতা দিতে হবে। অন্যান্য সার্ভিসকেও এধরনের সংস্থা তৈরি করতে হবে। এছাড়া প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সংবাদ তৈরির প্রক্রিয়া সার্ভিসের অফিসার দ্বারা পরিচালনা করতে হবে।

আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে চীন ও পাকিস্তানের দ্বিমুখী আলেখ্যে দেখতে হবে আর দেখতে হবে সন্ত্রাসবাদীদের দমন করার উদ্দেশ্য নিয়ে। আমাদের প্রতিবেশীদের মনে আমাদের সামরিক শক্তি সম্বন্ধে আস্থা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা বেড়ে চলেছে। ▯

(লেখক বিশিষ্ট প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিশ্লেষক।
সৌজন্যে : দি সেন্টিনেল)

নেত্রদান মহাদান

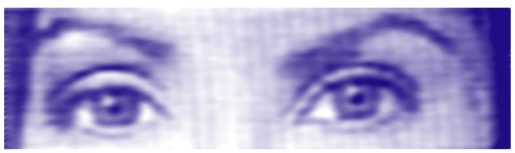

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

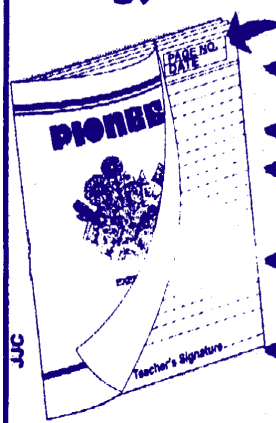

- প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
- পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
- আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
- ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
- প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
- ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
- প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature..... কলাম।

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road,
Kolkata - 10, Phone : 2373-0556, 2370-4152
Fax : 2373-2596,
E-mail : pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

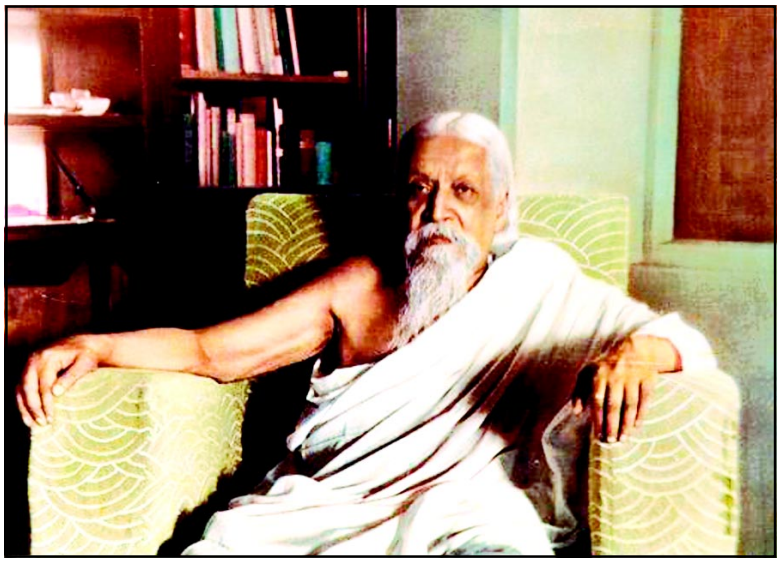

অতিমানস সত্তা ও শ্রীঅরবিন্দ

নীহারেন্দু ভট্টাচার্য

লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে ভারত ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা পেল। প্রায় দু'শ বছরের পরাধীনতার গ্লানি সহ্য করে আমরা অর্জন করতে পেরেছি আমাদের আরাধ্য স্বাধীনতা। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলেও কোটি কোটি কর্মহীন মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে বাস করছেন। সকলের জন্য শিক্ষা, সকলের জন্য বাসস্থান, সকলের জন্য স্বাস্থ্য আজও নিছক স্লোগান হয়েই আছে। শুধু দেশভাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেলাম। কিন্তু স্বাধীনতার পরও কি আমাদের চোখের জল শুকিয়েছে? স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ও মানবপ্রেমিক শ্রীঅরবিন্দ দেশ বিভাগকে সাদরে গ্রহণ করেননি। দেশ ভাগ তিনি চাননি। দেশকে শ্রীঅরবিন্দ দিব্য জননী রূপে চিন্তা করার জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করে গেছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ঠিক ৭৫ বছর আগে আর এক পনেরো আগস্টে জন্ম নিয়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও মানবপ্রেমিক শ্রীঅরবিন্দ। এ এক আশ্চর্য যোগাযোগ। দিব্য শক্তির অনুমোদনই শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনেই ভারতবর্ষ লাভ করলে বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতার পরেও ভারতবাসীর দুঃখ কষ্টের অবসান ঘটেনি। স্বাধীনতার মূল মন্ত্র ছিল এক জাতি, এক প্রাণ একতা। কিন্তু তা সফল হয়নি। শ্রীঅরবিন্দের স্বদেশ সাধনা ছিল এক পূর্ণ অখণ্ড স্বাধীনতা। তিনি ছিলেন অখণ্ড স্বাধীন ভারতের পূজারী। তাই খণ্ড স্বাধীনতা তাঁর নিকট ছিল চরম বেদনাদায়ক। ১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্ট শ্রীঅরবিন্দ ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে যে বাণী দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছেন— ''ভারত স্বাধীন, কিন্তু একত্ব সে লাভ করেনি। এ তার দীর্ণ খণ্ডিত স্বাধীনতা। ...দেশের বিভাগ দূর হওয়া চাই— যে উপায়েই হোক। ...যে উপায়েই হোক, খণ্ডতাকে যেতে হবে। তা না হলে ভারতের ভবিতব্য সাঙ্ঘাতিকভাবে ক্ষুণ্ণ হবে। এমন কি ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তা ঘটতে দেওয়া হবে না।''

শ্রীঅরবিন্দের ভারত রাজনীতিতে অবস্থান ছিল স্বল্পকালীন। কিন্তু তা চিরকালীন হয়ে আছে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে। একে সময়ের ব্যাপ্তি দিয়ে মাপা যায় না। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় সম্পাদক থাকাকালীন শ্রীঅরবিন্দ বৃটিশের শাসননীতির বিরুদ্ধে দিনের পর দিন 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় তেজোময়ী লেখা লিখতে থাকেন। স্বদেশী যুগে শ্রীঅরবিন্দের রাষ্ট্রনৈতিক রচনা ও কার্যাবলী পর্যালোচনা করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— ''অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার— হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু স্বদেশ আত্মার। বাণীমূর্তি তুমি।''

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বিপ্লবাত্মক রূপ দেবার জন্য যখন শ্রীঅরবিন্দের প্রচেষ্টা চলছিল তখনই আন্দোলনের গতি স্তব্ধ করতে বৃটিশ সরকার মিথ্যা বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তার করে লালবাজার থানায় নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে তাকে বিচারাধীন বন্দী হিসাবে আলিপুর জেলে রাখা হয়। ১৯০৯ সালে আলিপুর জেলে থাকার সময়েই শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয় রাজনীতি থেকে চিরবিদায় নেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'কারা কাহিনী'তে লিখেছিলেন— ''যখন পুনরায় আমি কর্মযজ্ঞে প্রবেশ করবো তখন আর সেই পুরাতন অরবিন্দ ঘোষ রূপে নয়। সেই আমি এক নতুন সত্তা, নতুন চরিত্র নতুন বুদ্ধি, নতুন প্রাণ, নতুন মন নিয়ে নতুন ভাবে কাজে অংশ নেবো। দীর্ঘ সময় ধরে আমার অন্তরের ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য গভীরভাবে আমি সাধনা করেছি। ...কিন্তু হাজারো কাজের ভিড়ে, অজ্ঞানতার অন্ধকারে আমার সেই প্রয়াস সফল হয়নি। অবশেষে ঈশ্বর এই সব বাধা সরিয়ে আমাকে যোগাশ্রমের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করলেন। বৃটিশের পীড়ন আমায় ঈশ্বরকে খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে।''

শ্রীঅরবিন্দ ভারতের যুগোত্তীর্ণ ভূমিকাকেও ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর মতে, অতীতে ভারত ছিল চিন্তা ও শান্তির আশ্রমকুঞ্জ। জন্ম দেয় এক নতুন সভ্যতার।

যার আলো ছড়িয়ে পড়ে দিক থেকে দিগন্তে। এর পরেই নানা বিদেশি অভিযানের ফলে ভারত তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু এই অধ্যায় শেষ হতে চলছে। 'ভারত জগতকে জীবনের আলো দেখাবে' এই ছিল শ্রীঅরবিন্দের বিশ্বাস। তিনি বলেছিলেন পৃথিবী ভারতকে চায় এবং চায় শুধু স্বাধীন ভারতকে। ভারত জগৎকে দেবে তাঁর অধ্যাত্ম জ্ঞান আর জীবনকে আধ্যাত্মিক করে তুলবার সাধনা। শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতির মূল ভিত্তি ছিল আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিক চেতনায় প্রতিষ্ঠিত না হলে মানুষের মানবীয় মূল্যবোধেরও যথাযথ স্ফুরণ হবে না। একমাত্র মানব চেতনার রূপান্তরের মাধ্যমেই দুঃখ কষ্টের অবসান ঘটানো সম্ভব। শ্রীঅরবিন্দের মতে বিবর্তনের ধারায় পাথর থেকে উদ্ভিদে, উদ্ভিদ থেকে পশুতে এবং পশু থেকে মানুষে রূপান্তর ঘটেছে। মানুষ নিজেকে

উন্নতির চরম অবস্থা বলে মনে করে। মনে করে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। এক্ষেত্রে সে ভ্রান্ত। স্থূল প্রকৃতিতে এখনও সে প্রায় পুরোপুরি পশুই। একটা চিন্তাশীল ও বাক্যশীল পশু। প্রকৃতি কিন্তু এই ত্রুটিপূর্ণ অবস্থাতে কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। প্রকৃতির ইচ্ছা হলো এমন মানুষকে গড়ে তুলবে যা আকারে হবে মানুষ কিন্তু তাঁর চেতনা মন ছাড়িয়ে অজ্ঞানের দাসত্ব মুক্ত হয়ে বহু দূরে উঠে যাবে। বিশ্বের মানুষের কল্যাণের জন্য এবং মানবজীবনকে দিব্য জীবনে রূপান্তরের জন্য শ্রীঅরবিন্দ সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে (১৯১০-১৯৫০) দক্ষিণ ভারতের পন্ডিচেরীতে গভীর সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের স্বপ্ন ছিল এক বিশ্বমিলন যাকে কেন্দ্র করে সমগ্র মানব জাতি এক সুন্দরতর, উজ্জ্বলতর ও মহত্তর জীবনের অধিকারী হবে। একমাত্র মানবচেতনার পরিবর্তনের মাধ্যমেই এই বিশ্ব মিলন সম্ভব। শ্রীঅরবিন্দ মনের উপরের সর্বশেষ স্তরের নাম দিয়েছেন অতিমানস স্তর। তিনি বলেছেন এই অতিমানস স্তরে পৌঁছালেই মানুষের দুঃখ কষ্টের অবসান ঘটবে। তখন মানব দেহ হবে দিব্য দেহ, মানব প্রাণ হবে দিব্য প্রাণ এবং মানবজীবনে আসবে ভগবানের প্রকাশ। এই অতিমানস স্তরে পৌঁছানোর জন্য শ্রীঅরবিন্দ আমাদের এক ত্রিমুখী সাধনার পথ নির্দেশ করেছেন। এই তিনটি হলো— (১) আস্পৃহা, (২) পরিবর্জন, (৩) সমর্পণ।

আস্পৃহা মানে অন্তরের মধ্যে নিরন্তরের জন্য জাগিয়ে রাখা একটা তীব্র অভীপ্সার বেগ, আগ্রহ, আকিঞ্চন, আকুতি। কিন্তু কিসের জন্য এই আস্পৃহা? কিসের জন্য আকিঞ্চন? যে জিনিস আমি এখনও পাইনি, যে আলো আমার মধ্যে আজও উদ্ভাসিত হয়নি, যে উচ্চচেতনা আমার মধ্যে এখনও ফোটেনি, তাকেই পাবার জন্য আমার একান্ত আস্পৃহা। আর যে অপূর্ণতা এখনও আমার মধ্যে রয়ে গেছে তাকেই পূরণ করবার জন্য আকিঞ্চন।

কিন্তু আস্পৃহার মধ্যে প্রচুর তীব্রতা ও ঐকান্তিকতা না থাকলে সে আস্পৃহা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। যার যতটা ঐকান্তিকতা তার ততটাই সাফল্যের সম্ভাবনা। আন্তরিক একটি আস্পৃহাই থাকবে, ভগবানের প্রকৃতিতে নিজের প্রকৃতির রূপান্তর ও ভগবানের সঙ্গে মিলন। এ-ই হবে একমাত্র আদর্শ ও লক্ষ্য।

শ্রীঅরবিন্দের ভারত রাজনীতিতে অবস্থান ছিল স্বল্পকালীন। কিন্তু তা চিরকালীন হয়ে আছে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে। একে সময়ের ব্যাপ্তি দিয়ে মাপা যায় না। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় সম্পাদক থাকাকালীন শ্রীঅরবিন্দ বৃটিশের শাসননীতির বিরুদ্ধে দিনের পর দিন 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় তেজোময়ী লেখা লিখতে থাকেন।

তার জন্য চাই ভগবানের কৃপার জন্যও আস্পৃহা। আর প্রত্যাখ্যান বা পরিবর্জন করতে হবে অবাঞ্ছিত যত চিন্তাভাবনাকে। প্রত্যাখ্যান করতে হবে অনভিপ্রেত যত দেহের ক্রিয়াকে, মনের ক্রিয়াকে, প্রাণের ক্রিয়াকে। আমাদের দেহ, প্রাণ ও মনঃপ্রকৃতির মধ্যে রয়েছে অনেক মূঢ়তা, ক্ষুদ্রতা, তামসিকতা, অলসতা, সন্দেহ, কামনা, গর্ব, লোভ, দম্ভ, অহংকার ভ্রান্ত ধারণা, একগুঁয়েমি, আত্মগরিমা ইত্যাদি। এই সবগুলিকে একে একে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন প্রত্যাখ্যান ও আস্পৃহার সঙ্গে সঙ্গে চাই ভগবানের কাছে পূর্ণ সমর্পণ। সমর্পণের অর্থ হলো ভগবানের কাছে নিজেকে ও নিজের সব কিছুকে নিবেদন করে দেওয়া। তাহলেই ক্রমে মানবজীবন দিব্যজীবনে রূপান্তরিত হবে। ১৯৫০ সালের ৫ ডিসেম্বর ৭৮ বছর বয়সে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পার্থিব দেহ ত্যাগ করেন। তখনই তাঁর দেহে অতিমানস-শক্তির অবতরণ ঘটেছিল।

তাই দেহত্যাগের পরও প্রায় একশ ঘণ্টা ধরে তাঁর দেহ থেকে অতিমানসের সোনালী আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে এটা ছিল পরম বিস্ময়।

অবশেষে পঞ্চম দিনে তাঁর দেহ থেকে অতিমানসের দিব্যজ্যোতি অন্তর্হিত হলো এবং আশ্রম প্রাঙ্গণে তাঁর দেহকে সমাহিত করা হয়। শ্রীঅরবিন্দ আজ আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তাঁর অমর আত্মা আজও সারা পৃথিবীতে মিশে আছে। শ্রীঅরবিন্দ জগতের সামনে তুলে ধরেছেন নবজীবনে উত্তরণের পথ, দিব্যজীবনে রূপান্তরিত হওয়ার পথ, বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধনের পথ। আজ জাতির স্মরণীয় দিন। পুণ্য দিন। আসুন আমরা সবাই মিলে এই পুণ্য দিনে শ্রীঅরবিন্দের সাধনালব্ধ কল্যাণকর আদর্শ অনুসরণের চেষ্টা করি এবং তাঁর বিশ্বমিলনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করি।

ভারত তার মহান ও ঐতিহ্যময় ভাবধারায় আবারও উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক। ৬৬তম স্বাধীনতা দিবসে এটাই হউক আমাদের সবার প্রার্থনা।

(ঋষি অরবিন্দের ১৪১তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত)

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

সমাবেশ সমাচার

ক্রীড়া ভারতীর প্রথম দক্ষিণবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সর্বভারতীয় ক্রীড়া সংস্থা ক্রীড়া ভারতীর দক্ষিণবঙ্গের প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলন গত ৪ ও ৫ আগস্ট মানিকতলাস্থিত কল্যাণ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বিভিন্ন জেলা থেকে ৩০ জনের বেশি প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রাদেশিক স্তরে খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদও ছিলেন।

৫ আগস্ট সকালে ক্রীড়া ভারতীর পক্ষ থেকে স্মারক ও উত্তরীয় দিয়ে শতায়ু (১০১ বছর) বিশ্বশ্রী মনোহর আইচকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। উত্তরীয় ও স্মারক তুলে দেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত এবং ক্রীড়া ভারতীর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাজ চৌধুরী। শ্রী চৌধুরী ক্রীড়া ভারতীর আদর্শ ও উদ্দেশ্য সবার সামনে প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত এবং তীরন্দাজিতে সর্বভারতীয় টেকনিক্যাল পরামর্শদাতা রথীন দত্ত। শ্রীদত্তকেও ক্রীড়া ভারতীর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

সবশেষে উপস্থিত অতিথি ও কার্যকর্তাদের ধন্যবাদ জানান ক্রীড়া ভারতীর দক্ষিণবঙ্গ শাখার সহ সভাপতি দিলীপ রায়। প্রসঙ্গত, শ্রীরায় পশ্চিমবঙ্গ খো-খো অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। সবমিলিয়ে প্রথম সম্মেলন সফল বলা যেতে পারে। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই ক্রীড়া ভারতীর প্রাদেশিক সমিতি গঠিত হয়েছে।

স্মরণসভা : কবি বীতশোক ভট্টাচার্য

গত ২ আগস্ট মেদিনীপুর শহরের বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিকরা ফিল্ম সোসাইটি হলে এক সভায় মিলিত হয়ে কবি বীতশোক (প্রকৃত নাম অশোক ভট্টাচার্য)-এর স্মৃতিচারণা করেন। মৃত্যুর পরে তিনি আরও উজ্জ্বল প্রতিভাত হবেন অগণিত ছাত্রের ও কবিতা পাঠকের হৃদয়ে— এই দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন বিপ্লব মাজী, নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ সাঁতরা, কৃষ্ণা মাইতি, প্রভাত মিশ্ররা। 'তুমি কি কেবলই ছবি'— এই মনোজ্ঞ সঙ্গীত পরিবেশন করে অমিতেশ ভট্টাচার্য বেদনাবিধুর করেন এই বিষণ্ণ সন্ধ্যাটিকে। অনুষ্ঠানে স্মরণিকা প্রকাশ করেন অভিনন্দন মুখোপাধ্যায়। স্মরণিকায় দেবাশিস প্রধান লেখেন— ঠিক এলে, জলের কাছেই / এত জল আর জল, ভেতরে ভেতরে বাজে অন্তর কোলাহল। ছাত্রজীবনে উনসত্তর সালে দেশ পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশেই কবি-পরিচিতি। মেদিনীপুর কলেজে অধ্যাপনাকালে 'অন্যসুখের সখা', 'দ্বিরাগমন', 'এসেছি জলের কাছে' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পায়। সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য তার কবিতা। তাই খেদোক্তি— আমার কবিতার একমুষ্ঠি পাঠক।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

গত ২ আগষ্ট রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে নবগ্রাম মণ্ডলের উদ্যোগে রিষড়ায় রাখীবন্ধন উৎসব

‘শ্রদ্ধা’র শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ২৬ জুলাই সিউড়ি শহরের সন্নিকটে চন্দ্রভাগা নদী তীরবর্তী রায়পুর গ্রামের আশ্রমে জনৈক উচ্চকোটির সাধক ১০৪ বছরের রঘুবীর গোস্বামীর ইচ্ছামৃত্যু দর্শন করলো হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ। তাঁর ইচ্ছামৃত্যুর কথা জানতে পেরে ওইদিনই সকালে সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণুর নেতৃত্বে ‘শ্রদ্ধা’ সংগঠনের সদস্যরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

মঙ্গলনিধি

কাঁথি জেলার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বালিঘাই খণ্ডের শারীরিক প্রমুখ চন্দন মাইতির বিবাহ উপলক্ষে ১০০০ টাকা মঙ্গলনিধি হিসেবে প্রদান করলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর বিভাগ কার্যবাহ প্রকাশরঞ্জন মণ্ডল, এগরা মহকুমার ব্যবস্থা প্রমুখ ডাঃ উৎপল মান্না ও অন্যান্যরা।

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু’দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর ‘‘চিঠিপত্র’’ কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার (যদি থাকে) থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না।

— সঃ স্বঃ

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, গোপালীর উদ্যোগে খড়্গপুরে সারাদিন ব্যাপী জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হয়।

HB ®

INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174

Sister Concern

Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE ®

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

অন্য রকম

সাপুতারায় এক আশ্চর্য ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সাপুতারা জায়গাটাকে বাংলার লোকজন তেমন চেনেন না। জায়গাটা মনোরম তাতে কোনও সন্দেহ নেই। গুজরাটের ডাং জেলার সহ্যাদ্রি পর্বতমালার দক্ষিণগাত্রে ছোট্ট পার্বত্য শহর সাপুতারা রাজধানী আমেদাবাদের দক্ষিণে প্রায় ৪২০ কিমি (২৬০ মাইলের দূরত্ব) সেখানে বছর বছর এমন এক ঘটনা ঘটে চলে যাকে আশ্চর্য বলা যায় বটে, কিন্তু বারংবার একই ঘটনা ঘটলে তা আর আশ্চর্য থাকে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। বর্ষার ঘ্যানঘ্যানানি যাদের কাছে অসহ্য, কিংবা বর্ষার প্রকৃতি যাঁদের অত্যন্ত প্রিয়, এই দুই বিপরীতধর্মী মানুষই একবার বর্ষার সময়ে সাপুতারায় ঘুরে আসতে পারেন। শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল যাঁরা দেখেছেন, তাঁদর কাছেও সাপুতারার বর্ষা উৎসব অন্যরকমের আমেজ নিয়ে আসবে। শান্তিনিকেতনে সাংস্কৃতিক পরিবেশ সহজবোধ্য কারণেই সাপুতারায় পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃতি যেন তার সাজের পসরা নিয়ে হাজির হয় ছোট্ট পার্বত্য শহরটিতে। মেঘ আর কুয়াশার অপরূপ মেলবন্ধন পাহাড়কে নতুন সাজে সাজিয়ে তোলে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, পাহাড়ের এই সাজ বছরের আর অন্যকোনও সময় দেখা যায় না। প্রকৃতিও কি বোঝে, বর্ষা উৎসবে তাকে ঢেলে দিতে হবে তার যত রূপমাধুরী? এই অত্যাশ্চর্য ঘটনার ব্যতিক্রম মনে করতে পারছেন না প্রবীণরাও। যারা খাদ্যরসিক, তাঁদের এসময় নিরাশ করে না সাপুতারা। তবে একটা কথা বলে রাখা ভাল, বর্ষার আগমনে পাহাড় জুড়ে চোখ জুড়ানো সবুজের ঢল নামে। সেই টাটকা নির্ভেজাল শাকসব্জীর স্বাদ একবার যারা আস্বাদন করেছেন, জীবনে আর কখনও আমিষ ছুঁতে চাইবেন কিনা সন্দেহ। সবচেয়ে মজার ব্যাপার সাপুতারা এই বর্ষার কথা বহির্বিশ্বে আর অজানা নয়। বিশ্বের অধিকাংশ টুরিস্ট স্পট যেখানে বছরের প্রায় সবসময়ই ভর্তি থাকে, সেখানে বর্ষা বাদে বাকি পাঁচ ঋতুকেই সাপুতারা নামক শৈলশহরটি বিলকুল ফাঁকা থাকে, কেবল বর্ষাতেই যত সংখ্যক পর্যটক ভিড় করেন, এখানে ঠিকঠাক কাজে লাগাতে পারলে পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত মানুষজনের সারা বছর আর কিছু কাজ না করলেও চলে। সাপুতারা বর্ষা উৎসবে প্রদর্শনী, কৌতুক প্রতিযোগিতা, বর্ষা খাদ্য মেলাই মূলত প্রধান। গত ৪ আগস্ট থেকে এই বর্ষা উৎসব শুরু হয়েছে। চলবে মাস-ভর। দেখা গেল এক যুবকের কাঁধে একটি আস্ত বাঘ। অম্লানবদনে চলেছে যুবকটি। আঁতকে উঠবেন না। সত্যি বাঘ নয়। খড়ের বাঘ। কিন্তু এমন চমৎকার ভাবে বানিয়েছে যে দেখলে কে বিশ্বাস করবে এটা সত্যিকারের বাঘ নয়। এমনই নানা বিচিত্র ঘটনায় উদ্‌যাপিত হয় সাপুতারার বর্ষা উৎসব।

যেন সত্যিকারের বাঘমামাই কাঁধে চড়ে চলেছে।

এলাকার বাসিন্দারা সারা বছর চেয়ে থাকেন বর্ষার দিকেই। উৎসব পালনের জন্যও বটে, আর বিশ্বের কাছে নিজেদের তুলে ধরতেও বটে।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায়
রান্নাটা
ডাটা
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ

দেশভাগ : সাম্প্রতিক সমীক্ষা

নীতিন রায়

দেশভাগের অখণ্ড যন্ত্রণা হিন্দুরা বয়ে চলেছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হিন্দুরা ক্রমাগত ক্ষয়ের দিকে। বাংলাদেশ সামাজিক রাজনৈতিক ও সরকারিভাবে হিন্দু ভাগাও, পাক্-ভূমি বাড়াও— এই নীতি নিয়ে চলছে। এই হৃদয়বিদারক ঘটনা দিনের পর দিন ঘটে চলেছে। কিন্তু তা হিন্দুর মনে নাড়া দেয়নি। কোনও প্রতিবাদ নেই। কলকাতায় বামপন্থীরা প্যালাইস্টাইনের জন্য মিছিল করছে। কিন্তু বাংলাদেশের হিন্দুদের জন্য কংগ্রেস, তৃণমূল ও বামপন্থীরা একটি কথাও বলেনি।

অথচ একজন অহিন্দু হিন্দুর ব্যথায় ব্যথিত হয়ে একটি বই লিখেছেন। সেই অহিন্দু লেখকের নাম হলো রিচার্ড বেনকিন (Richard Benkin)। তার বইটির নাম 'এ কুয়াইট কেস অফ এথনিক ক্লিনসিং : দ্যা মার্ডার অফ্ বাংলাদেশী হিন্দু।'

পাকিস্তান হওয়ার সময় পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৩৩ শতাংশ, ১৯৭১ সালে তা এসে দাঁড়ায় ২০ শতাংশে। বর্তমানে তা হলো ৮ শতাংশ। সরকারি নিষ্ক্রিয়তায় যে হত্যা, ধর্ষণ, অপহরণ, জোর পূর্বক ধর্মান্তরকরণ, মন্দির আক্রমণ, জমি দখল চলছে তা বোঝাতে বেনকিন 'টলারেটেড' শব্দটি ব্যবহার করছেন।

পাকিস্তান ও বাংলাদেশে যে ঘটনা ঘটে চলেছে তা অনুমানযোগ্য ছিল না এমন নয়। পাঞ্জাবের তখনকার প্রধানমন্ত্রী শওকত হায়াৎ খান বলেছিলেন, পাকিস্তানে হিন্দুদের থাকতে দেওয়া হবে না। সাবিত্রী নামে এক মহিলা যিনি আদতে গ্রীক এবং ধর্মান্তরিত হিন্দু তিনি একটি বই লেখেন। বইটির নাম 'ওয়ারনিং টু দ্যা হিন্দু'। দেশ ভাগের এক দশক আগে বইটিতে তিনি হিন্দুদের সাবধান করে দেন। কয়েকটি জায়গা থেকে হিন্দুদের উৎখাত হওয়ার আশংকার কথাও তিনি এই বইটিতে উল্লেখ করেন। আজ দেখা যাচ্ছে, তাঁর সতর্কবাণী সত্য হয়েছে।

> "মিলিয়ন লোক অত্যাচারের মুখোমুখি, আর বিলিয়ন লোক আশ্চর্যজনকভাবে চুপচাপ। অনেকে মনে করেছিলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশের অবস্থা পাল্টাবে। কিন্তু পাল্টায়নি। শত্রুসম্পত্তি আইন ভেস্টেড সম্পত্তি আইন হিসাবে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু সরকারের অধিগৃহীত অথবা জোর করে দখলীকৃত সম্পত্তি এই আইনে তা ফেরত দেবার ব্যবস্থা নেই।"

বেনকিন যেন মজা করে বলছেন, মিলিয়ন লোকের হত্যা, মিলিয়ন লোক অত্যাচারের মুখোমুখি, আর বিলিয়ন লোক আশ্চর্যজনকভাবে চুপচাপ। অনেকে মনে করেছিলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশের অবস্থা পাল্টাবে। কিন্তু পাল্টায়নি। শত্রুসম্পত্তি আইন ভেস্টেড সম্পত্তি আইন হিসাবে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু সরকারের অধিগৃহীত অথবা জোর করে দখলীকৃত সম্পত্তি এই আইনে তা ফেরত দেবার ব্যবস্থা নেই। ১৯৭১ সালে হিন্দুরা বাড়ী গিয়ে দেখে সমস্ত সম্পত্তিই মুসলিমদের দখলে। হিন্দুদের দুরবস্থার ও বিতাড়িত হওয়ার জন্য কয়েকটি কারণ-কে তিনি চিহ্নিত ও ব্যাখ্যা করেছেন— (১) ভি পি এ বা ভেস্টেড সম্পত্তি আইন, (২) ইসলামিক বিপ্লব, (৩) ভয়াবহ দুর্নীতি, (৪) ইসলামিক সমাজ হিন্দুদের সুরক্ষা দিতে অপারগ, (৫) আক্রান্ত ব্যক্তিদের সুরক্ষা দিতে না পারা এবং (৬) সংবিধানকে সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত করতে না পারা।

আর বেনকিন আশ্চর্যজনকভাবে একটি সত্য তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, ভারতীয় নেতৃত্ব লিয়াকত-নেহরু এবং ইন্দিরা-মুজিব চুক্তিকে বাস্তবায়িত করতে পারেনি। তিনি আরও বলেছেন, মাওবাদী ও ইসলামিক শক্তি ভারতবর্ষকে টুকুরো করার জন্য সংগঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, হিন্দুরা ইসলামের প্রকৃত চরিত্র অনুধাবন করতে পারেনি। বাংলাদেশী হিন্দুদের যেভাবে উৎখাত করা হয়েছে তার সঙ্গে মিল রয়েছে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক যেভাবে বেনী কাইনোকা, বেনী কোরজইয়া এবং অন্যান্যদের উৎখাত করেছেন। বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের এভাবে উৎখাত অভিযানে ভারতবর্ষকে চুপ করে থাকতে দেখে বেনকিন অবাক হয়েছেন।

এছাড়া বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতন নিয়ে আরও একটি রিপোর্ট তৈরি করেছেন ইউ এন ও বা রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিযুক্ত অফিসার সাউন আর গ্রেগরী এবং সিমন আর ভেলেন্টাইন। ইউনাইটেড নেশন্স হাইকমিশনার ফর রিফিউজিস স্টেটাস ডিটারমিনেশান অ্যান্ড প্রোটেকশান ইনফরমেশানস সেক্সান কর্তৃক তাঁরা নিয়োজিত হয়েছিলেন। পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের নিয়ে তাঁরা এই রিপোর্ট তৈরী করেন।

এই রিপোর্টের প্রাক্ কথায় ১৯৪৬ ও ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গণহত্যা নিয়ে এক যে প্রস্তাব পাশ করে তার উল্লেখ আছে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী গণহত্যা হচ্ছে সেইসব ক্রিয়াকর্ম যা

অন্য কোনও সম্প্রদায়, জাতি, এবং ধর্মীয় জাতিসত্তার ধ্বংস অনিবার্য করে তোলে। তা আংশিক বা সম্পূর্ণ হতে পারে।

১৯৪৭ সাল ভারত ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। এই ভাগের ষড়যন্ত্রে বৃটিশ রাজনীতিবিদ, গান্ধী নেহরু ও জিন্না সামিল ছিলেন। এরাই লক্ষ মানুষের জীবনহানির মূল কারণ। কায়েদে আজম জিন্নার মুসলিমদের প্রতি সমর্থন ছিল প্রশ্নাতীত। কিন্তু গান্ধী ও নেহরু সারাজীবন ধরে এই কথাই বোঝতে চেষ্টা করেছেন যে জিন্না মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি নন। অথচ ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচনে জিন্নাই মুসলিমদের নেতা হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করেন এবং এই নির্বাচনের এক বছরের মধ্যে দেশ ভাগ হয়।

জিন্নার ইচ্ছাই জয়ী হয় এবং তাঁর ইচ্ছাই পাকিস্তান সৃষ্টির কারণ। জিন্নার প্রস্তাব ছিল—

(১) ভারত ভাগের পর হিন্দুস্থান হবে হিন্দুদের জন্য এবং পাকিস্তান হবে মুসলিমদের জন্য।

(২) লোক বিনিময় করতে হবে।

(৩) এরপরও যারা থাকবে তারা হবে জিম্মি। জিন্নার দেওয়া প্রস্তাব গান্ধীজী ও নেহরু দ্বারা ধিকৃত হয়। কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রস্তাব ছিল বাস্তবসম্মত এবং হিন্দুরা এর দ্বারা উপকৃত হোত।

১৯৫০ সালের ১৯ এপ্রিল ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পার্লামেন্টে বলেন, ভারতের ভালোমানুষী পাকিস্তান দুর্বলতা হিসাবে ধরে নিয়েছে। তারা সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারে বন্ধ করেনি। সাম্প্রতিককালে নেহরু লিয়াকত চুক্তি যে ব্যর্থ তা প্রমাণিত হয়েছে।

গ্রেগরী ও ভেলেন্টাইনের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে পাকিস্তানের জনসংখ্যা ১৭২ মিলিয়ন। তার মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ৯৫.৯৬ শতাংশ। তার ভিতর সুন্নি মুসলিম ৮০ শতাংশ এবং শিয়া মুসলিম ২০ শতাংশ। সংখ্যালঘুর সংখ্যা ৪-৫ শতাংশ। সংখ্যালঘুদের মধ্যে আবার খৃস্টানের সংখ্যা ৩.৫ মিলিয়ন, হিন্দু ২.৫ মিলিনয়ন, জিকিরি ৭ লক্ষ, আহমেদিয়া ২.৪৫ লক্ষ, শিখ ৫০ হাজার, বাহাই ৩০ হাজার, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ২০ হাজার, জুরাথ্রেস্টাস ৫ হাজার এবং ইহুদি সামান্য রয়েছে।

এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে এই গোষ্ঠীগুলি নির্দিষ্টভাবে বা সামগ্রিক ভাবে স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায় দ্বারা অত্যাচারিত। কোথাও বা ইসলামিক সংগঠন যেমন পাকিস্তানি ও তালিবান দ্বারা অত্যাচারিত।

পাকিস্তানে দু' ধরনের আইন রয়েছে— একটি হলো বৃটিশ এবং অন্যটি শরিয়তি বা কোরান আশ্রিত আইন। কোরানের নির্দেশিত সীমানার বাইরে গেলেই শাস্তি হবে। ১৯৭৯ সালে হোদদ আইনের প্রয়োগ হয়। ১৯৮৪ সালে প্রয়োগ হয় '' কোয়ালুন ই শাহাদাত''। এই আইনের চোখে পুরুষের অধিক মূল্য। মুসলিম মেয়েদের সাক্ষী হিসেবে অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ১৯৮২ সালে নাস্তিকতা আইন পাশ হয়। ইসলামের অমর্যাদা করলে এই আইনের আওতায় মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি রয়েছে। ১৯৮৬ সালে বিশপ জন যোশেফ কোর্ট চত্বরে এ আইনের প্রতিবাদে আত্মহত্যা করেছেন। পাকিস্তানের অনেক হিন্দুই খৃস্টান হয়েছেন অথবা খৃস্টান ও হিন্দু রীতি নীতির জগা খিচুড়ী পালন করে জীবন কাটাচ্ছেন।

২০০৬ সালে ক্যাথলিক চার্চ তার রিপোর্টে হিন্দুদের উপর আদর্শগত এবং পরিকল্পিত ভাবে আক্রমণ চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে। এর মূলে কাজ করছে—

(১) হিন্দু ও মুসলিমদের চিরচরিত শত্রুতা এবং

(২) ভারত ও পাকিস্তানের উত্তেজনায়, পাকিস্তানে হিন্দুরা অত্যাচারিত হয়।

(৩) হিন্দুরা কোরানের বাণী অনুযায়ী কাফের এবং তাদের উপর সব অত্যাচারই পবিত্র কাজ।

(৪) বর্তমানে পাকিস্তানের সব হিন্দুই দরিদ্র। তাই এদের পালাবার পথ নেই।

পাকিস্তানে শিক্ষা ব্যবস্থায় ঘৃণা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। পাঠ্য বইতে রয়েছে হিন্দুরা সবই কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাই মুসলিমদের তৈরি থাকতে হবে সুযোগের অপেক্ষায়। যখন সুযোগ আসবে তখনই হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। পাকিস্তানের স্কুলপাঠ্যসূচীতে হিন্দুদের বিরুদ্ধে কুশব্দ ব্যবহার করা হয়।

পাকিস্তানে প্রথমে সংখ্যালঘু মেয়েদের অপহরণ ও ধর্ষণ করা হয়। যেহেতু সংখ্যালঘুদের সাক্ষীর আইনগত মর্যাদা নেই, সেহেতু তার সাক্ষী পাওয়া যায় না। অপরাধী বক্তব্য মেনে নিয়ে ''দারুল ই-আমন'' স্কুলে পাঠানো হয়। সেখানে সে ইসলামি জীবন পদ্ধতি শেখে। এবং তার থেকে জোর করিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হয়, যে স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়েছে এবং আদালত তা গ্রহণ করে ও ধর্মান্তর মেনে নেয়। অর্থাৎ মেয়েটি সুবিচারের বদলে অবিচার পায়।

পাকিস্তানের মিরপুরের মাথেলো গ্রামের জনৈক অধিবাসী রিংকেল। তার বাবা শ্রীযুক্ত নন্দলাল প্রাথমিক স্কুলে পড়ান। অপহরণকারীরা মেয়েটিকে অপহরণ করে নারেদ শাহের হাতে তুলে দেয়। নন্দলাল হিন্দু কাউসিলকে জানায়। আন্তর্জাতিক চাপে মামলা আদালতে গড়ায়। প্রধান বিচারপতির সামনেই রিংকেল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে জানায়— ''হুজুর পাকিস্তানে মুসলিমরা বিচার পায়। আমার জন্য বিচার নেই। আমাকে মেরে ফেলুন, কিন্তু দারুল আমানে পাঠাবেন না।'' হিন্দু মেয়েটি পাকিস্তানের বিচার ব্যবস্থা ও প্রশাসনের প্রতি প্রশ্নবোধক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বিচারের নামে হয় প্রহসন।

শেষপর্যন্ত ''দারুল আমান'' মেয়েটিকে মুসলমান করা হয়, মধুর নাম পাল্টে রাখা হয় 'ফেরিয়াল শাহ'। মানব (১৮) হেমি (১৬) রাজি (১৪) মাসু (১৩) দের ক্ষেত্রেও ঘটেছে একই ঘটনা। শরিয়াত আইনে অমুসলমানরা বিচার পায় না।

২০১১ সালে ৩ জানুয়ারি 'The Express Tribune' জানিয়েছে, হিন্দুরা পাকিস্তান থেকে পালাতে চাইছে। পাকিস্তানে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ১৯৪১ সালে ১৯.৭৫ শতাংশ। এখন তা কমে হয়েছে দাঁড়িয়েছে ২.৫ শতাংশে।

বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১৮ শতাংশ (১৯৪১) থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে ১০.৫ শতাংশ। ১৯৬১ থেকে বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যা ১৯৯১-তে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮ শতাংশ। অন্যদিকে পশ্চিমবাংলায় ১৯৬১ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত মুসলিমদের সংখ্যা ২০ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩.৬ শতাংশ। পশ্চিমবাংলায় ১৯৬১ থেকে ১৯৯১— এই সময়কালে মুসলিম সংখ্যা বেড়েছে ৩.৬ শতাংশ হারে। কিন্তু হিন্দুর সংখ্যা কমেছে ৪.১ শতাংশে।

জাতীয় পরম্পরার মেলবন্ধন
রূপসাগরে অরূপরতন

স্বস্তিকা পুজো সংখ্যা, ১৪১৯

—: উপন্যাস :—

সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত ▯ সুমিত্রা ঘোষ ▯ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

—: প্রবন্ধ :—

আজকের লালকেল্লা শাহজাহানের তৈরি নয়। ভারতবর্ষ বনাম ইণ্ডিয়া।
তিলকের প্রথম কারাবরণ ঃ শিবাজী উৎসব ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট।
রহস্যময় গঙ্গারিডি সভ্যতা। বাঙালি হিন্দুর মূল্যবোধ। রাষ্ট্র পরিচালনায় 'খড়ের মানুষের উপদ্রব'।
গাণিতিক বিস্ময় শ্রীনিবাস রামানুজম। মাধেরার সূর্যমন্দির। বাঙালিবাবুর বৈঠকখানা।
সুভাষচন্দ্রের জীবনে দেবী দুর্গা।

—: গল্প :—

গোপালকৃষ্ণ রায় ▯ রমানাথ রায় ▯ শেখর বসু ▯ জিষ্ণু বসু ▯ দীপঙ্কর দাস ▯ রত্না ভট্টাচার্য ▯ গোপাল চক্রবর্তী

—: রম্যরচনা :—

চণ্ডী লাহিড়ী ও পিনাকপাণি ঘোষ

—: দেবীভাবনা :—

ভিক্ষুদেব ভট্ট

এছাড়াও ভ্রমণসহ আরও অনেক কিছু। সব মিলিয়ে পরিবারের সবার সঙ্গে ভাগ করে পড়ার মতো একটি সংরক্ষণযোগ্য পুজো সংখ্যা।

সত্ত্বর কপি বুক করুন।

মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে। দাম : ৬০ টাকা।

অলিম্পিকের দিক্‌চক্রবালে উজ্জ্বল চীন ও এশিয়া

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত ও চীন, প্রায় একই সময়ে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দুটি দেশ। অথচ বিশ্ব অলিম্পিকে কি বিশাল বৈপরীত্যে ফুটে ওঠে দুটি দেশের অবস্থানে। চীন ২০০৮-এ নিজের দেশে সুপার অলিম্পিয়াড করে তাক লাগিয়ে দেয় গোটা বিশ্বকে। একইসঙ্গে পদক তালিকায় প্রবল শক্তিধর আমেরিকাকে হঠিয়ে শীর্ষস্থানে উঠে আসে এবং একই ধারা বজায় রাখে সম্পূর্ণ প্রতিকূল আবহের লন্ডনের মাটিতে। শেষ পর্যন্ত লন্ডন অলিম্পিয়াডে দু'নম্বর স্থানে চীন। তিন থেকে দশ নম্বর স্থানের মধ্যে আরও দু-একটি এশীয় দেশ রয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া, উত্তর কোরিয়া এবারের গেমসে চমকপ্রদ উত্থান দেখিয়েছে, যা প্রমাণ করে রাজনীতির মতো ক্রীড়াসংস্কৃতিতেও এশিয়া আজ গৌরবোজ্জ্বল। অথচ এর পাশে ১২০ কোটির ভারতবর্ষ কোথায়?

খেলা

লেখার মুখবন্ধ পড়ে তাই পাঠককুল সহজেই বুঝতে পারবেন ভারত ও চীনের মধ্যে তুলনার প্রতীকি ইঙ্গিতটি। ৬০ বছরের বেশি হয়ে গেল দুই দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির। এই সময়ের মধ্যে চীন বিজ্ঞান-প্রযুক্তির মতো ক্রীড়া ও শরীরচর্চাতেও পরিকল্পনাপ্রসূত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেকে তুলে নিয়ে গেছে অবিশ্বাস্য উচ্চতায়। আর স্বামী বিবেকানন্দের গর্বের ভারত, স্বপ্নের ভারত তার কোনও কথাকে কাজে পরিণত করার সদিচ্ছা না দেখিয়ে আজ অলিম্পিক সংসারে হাসির পাত্র। গতবারের অলিম্পিকে তাও একটি স্বর্ণপদক জুটে ছিল। এবারে কোনও সোনা নেই। সাকুল্যে ৬টি পদক, ২টি রূপো সহ ৪টি ব্রোঞ্জ। তাহলে ঘটা করে কমনওয়েলথ গেমস দিল্লীতে করে কি লাভ হলো? অস্ট্রেলিয়ার ঠিক পিছনে দুনম্বর স্থানে শেষ করে ভারত কমনওয়েলথ গেমসে। তখন এদেশের ক্রীড়ামহল বলে দু'বছর পরে লন্ডন অলিম্পিকে ১০টি মেডেল বাঁধা, অন্তত কমনওয়েলথ গেমসের এই সাফল্যের প্রেক্ষিতে। বাস্তবে দেখা গেল অলিম্পিকের ইতিহাসে সর্বোচ্চ পদক-প্রাপ্তি ঘটলেও বেজিংয়ের থেকেও খারাপ ফল। বেজিংয়ে যাও বা প্রথম পঞ্চাশে ছিল, এবার নেমে গিয়েছে পঞ্চান্নতে। অথচ সাহারা, মিত্তল শিল্পগোষ্ঠী লন্ডন অলিম্পিকেই প্রস্তুতির জন্য কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে। সরকারও সবরকম সহযোগিতা করেছে। এই ফল তাই মর্মদায়ক।

১৯০০—২০১২ এই একশো বারো বছরে ভারত অলিম্পিক আসর থেকে তুলেছে ২৬টি পদক। এর মধ্যে হকির ৯টি সোনা, শ্যুটিংয়ে অভিনব বিন্দ্রার একটি সোনা। আর বিশ্বনাথন আনন্দ সিডনি অলিম্পিয়াডে প্রদর্শনী ইভেন্ট দু-বার সোনা জয়ী। বাদবাকি পদকের মধ্যে পাঁচটি রূপো, বাকি সব ব্রোঞ্জ আর মাইকেল ফেলপস একাই তিন অলিম্পিয়াড থেকে তুলেছেন ২২ টি পদক, যার মধ্যে ১৯টি সোনা। জীবনের থেকে বড় অতিমানব এই মার্কিন কিংবদন্তী সাঁতারু প্রমাণ করেছেন আধুনিক অলিম্পিকে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ অলিম্পিয়ান। লন্ডন অলিম্পিকে তাঁরই মতো অতি প্রাকৃত কীর্তি গড়েছেন জামাইকার 'সুপারসনিক' উসেইন বোল্ট। বেজিং ও লন্ডন পরপর দুটি গেমসে স্প্রিন্ট ইভেন্টে 'ডাবল' করে রোল্ট অতিক্রম করে গেছেন কীর্তিখ্যাত সব গ্রেট মাস্টারদের। এই দুজনের নামে খানিকটা নিষ্প্রভ আর এক কিংবদন্তী— রজার ফেডেরার। জীবনে সব পেয়েছেন এই প্রজন্মের আদর্শ ক্রীড়াবিদ রজার। কিন্তু মহামূল্যবান অলিম্পিক সোনাটি এবারও হলো না। গত বছর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রাফায়েল নাদালের গলায় উঠেছিল এই জগৎচন্দ্র হারটি। এবার রজার ফাইনালে উঠেও স্বর্ণ সিংহাসনে বসতে পারলেন না।

তিরিশটি খেলা নিয়ে হয়েছে এবারের অলিম্পিয়াড। সব খেলাতেই প্রশ্নাতীত প্রাধান্য দেখিয়েছে চীন। তবে অস্ট্রেলিয়ার বিরাট ক্রীড়াঐতিহ্য এবার কিছুটা ধাক্কা খেয়েছে। প্রতিবার তারা প্রথম ৫/৬টি দেশের মধ্যে থাকে, এবার সেখানে উঠে এসেছে উত্তর কোরিয়া, কাজাখাস্থান। আমেরিকা, চীন ছাড়া গ্রেট বৃটেন, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, নেদারল্যান্ড নিজেদের সুনাম ও গরিমা অনুযায়ী ফলাফল করেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ভারত। অনেক আশা জাগিয়ে, স্বপ্নের ফানুস উড়িয়ে বড় কনটিনজেন্ট নিয়ে আই ও এ লন্ডনে গেছিল। বাস্তবে পাওয়া গেল একবার হতাশা, যা প্রতিটি অলিম্পিকেই একমাত্র ভবিতব্য। এই অলিম্পিক থেকে ভবিষ্যতের কোনও সোনালী রেখার ক্ষুদ্রতম বিন্দুও চোখে পড়ছে না। প্রত্যাশার পারদটিকে মাটিতে আছড়ে ফেলেছেন শ্যুটার রঞ্জন সোদী, গগন নারাং, তিরন্দাজ, দীপিকা কুমারী, রাহুল ব্যানার্জী, টেনিসের লি-হেশ। গগনের ব্রোঞ্জ পদক প্রাপ্তি মোটেও তাঁর প্রতিভা ও কীর্তির প্রতি সুবিচার করে না।

মেরিকম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বক্সার, তিনি কেন সেমিফাইনালেই আটকে যাবেন? সাইনা নেহওয়াল ও বিজয় কুমারের 'পোডিয়াম ফিনিশ বরঞ্চ যথার্থ মুন্সিয়ানার মানদণ্ড। এই অলিম্পিকের প্রাপ্তি। □

"সেদিন আমরা একত্র হইনি—আজও নয়"

কত বিপদ গিয়েছে। কই একত্র তো হইনি। বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরী তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেতেও তো একত্র হয়নি। তারপর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনও একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলেম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি।

[কালান্তর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'স্বামী শ্রদ্ধানন্দ' প্রবন্ধ—মাঘ ১৩৩৩]

সৌজন্য : আশিস কুমার মঙ্গল

৩৩, গোরাচাঁদ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০০৬

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান — দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের R চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

।। চিত্রকথা।। মহাভারত।। ৯

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

The Forest Friendly Company
100% NUKSAAN PROOF
HEAT SHIELD
Shields water & termite as well
DURO
DPS/SPIL/MAR12/024
Select DURO products come with a unique Heat shield – a classified heat resistant formula. The result of a dedicated R&D team & their well researched venture, DURO's Heat Shield technology ensures complete fire proof protection. Invest in them. Prevent your dreams from turning to ashes when there is still time.
FSC
www.fsc.org
FSC® C108194
The mark of responsible forestry
E1
DURO
BLOCK BOARD • PLYWOOD • VENEERS • DOORS
Sarda Plywood Industries Ltd. Website: www.sardaplywood.in | E-mail: info@sardaplywood.com | Toll Free Number: 1800-345-DURO(10am - 6pm Monday-Friday)
OUR BRANDS
DURO Pumaply
ALL WEATHER PROOF PLYWOOD
Durobord
DUROFLEX
PREMIUM FLEXIBLE PLYWOOD
DURODOOR
FLUSH DOOR
DURO NATURE SIGNATURE

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
20 August - 2012

FOR INTERIORS THAT EVOKE ADMIRATION

For over two decades, Centuryply has been effortlessly redefining interiors into designer spaces with the most stunning range of products that reflect the very best of style, innovation and functionality.

CENTURYPLY
Quality that's a class apart!
Fortifying interiors with innovations like the first flexible ply, a 7 year termite-proof, pay back guarantee and many more…

CENTURYVENEERS
Exotic designs in wood!
Beautifying Interiors with an exclusive and wide range of Decorative veneers (only BWR available in India) & Senzura Styles, handpicked from around the world...

CENTURYLAMINATES
Style that stands out!
Trendsetting interiors with the widest range of laminates having myriad textures, stunning patterns and exquisite designs…

Also available:
CENTURYMDF
CENTURYPRELAM

CENTURYPLY®

দাম : ৭.০০ টাকা